চোরাবালি

কুমার ত্রিদিবের বারম্বার সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ আর উপেক্ষা করিতে না পারিয়া একদিন পৌষের শীত-সুতীক্ষ্ণ প্রভাতে ব্যোমকেশ ও আমি তাঁহার জমিদারীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল দিন সাত-আট সেখানে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া, ফাঁকা জায়গার বিশুদ্ধ হাওয়ায় শরীর চাঙ্গা করিয়া লইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিব।

আদর যত্নের অবধি ছিল না। প্রথম দিনটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় অপর্যাপ্ত আহার করিয়া ও কুমার ত্রিদিবের সঙ্গে গল্প করিয়াই কাটিয়া গেল। গল্পের মধ্যে অবশ্য খুড়া মহাশয় স্যর দিগিন্দ্রই বেশী স্থান জুড়িয়া রহিলেন।

রাত্রে আহারাদির পর শয়নঘরের দরজা পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া কুমার ত্রিদিব বলিলেন, কাল ভোরেই শিকারে বেরুনো যাবে। সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি।'

ব্যোমকেশ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, 'এদিকে শিকার পাওয়া যায় নাকি?'

ত্রিদিব বলিলেন, 'যায়। তবে বাঘ-টাঘ নয়। আমার জমিদারীর সীমানায় একটা বড় জঙ্গল আছে, তাতে হরিণ, শুয়োর, খরগোশ পাওয়া যায়; ময়ূর, বনমুরগীও আছে। জঙ্গলটা চোরাবালির জমিদার হিমাংশু রায়ের সম্পত্তি। হিমাংশু আমার বন্ধু; আজ সকালে আমি তাকে চিঠি লিখে শিকার করবার অনুমতি আনিয়ে নিয়েছি। কোনো আপত্তি নেই তো?'

আমরা দুজনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, 'আপত্তি!'

ব্যোমকেশ যোগ করিয়া দিল, 'তবে বাঘ নেই এই যা দুঃখের কথা।'

ত্রিদিব বলিলেন, 'একেবারে যে নেই তা বলতে পারব না; প্রতি বছরই এই সময় দু'একটা বাঘ ছটকে এসে পড়ে—তবে বাঘের ভরসা করবেন না। আর বাঘ এলেও হিমাংশু আমাদের মারতে দেবে না, নিজেই ব্যাগ করবে।' কুমার হাসিতে লাগিলেন—'জমিদারী দেখবার ফুরসৎ পায় না, তার এম্নি শিকারের নেশা। দিন রাত হয় বন্দুকের ঘরে, নয় তো জঙ্গলে। যাকে বলে শিকার-পাগল। টিপও অসাধারণ—মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারে।'

ব্যোমকেশ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নাম বললেন জমিদারীর—চোরাবালি? অদ্ভুত নাম তো।'

'হ্যাঁ, শুনেছি ওখানে নাকি কোথায় খানিকটা চোরাবালি আছে, কিন্তু কোথায় আছে, কেউ জানে না। সেই থেকে চোরাবালি নামের উৎপত্তি।' হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আর দেরী নয়, শুয়ে পড়ুন। নইলে সকালে উঠতে কষ্ট হবে।' বলিয়া একটা হাই তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একই ঘরে পাশাপাশি খাটে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শরীর বেশ একটি আরামদায়ক ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল; সানন্দে বিছানায় লেপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঘুমাইয়া পড়িতেও বেশী দেরী হইল না। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম—চোরাবালিতে ডুবিয়া যাইতেছি; ব্যোমকেশ দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ক্রমে ক্রমে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া গেল; যতই বাহির হইবার জন্য হাঁকপাক করিতেছি ততই নিম্নাভিমুখে নামিয়া যাইতেছি। শেষে নাক পর্যন্ত বালিতে তলাইয়া গেল। নিমেষের জন্য ভয়াবহ মৃত্যু-যন্ত্রণার স্বাদ পাইলাম। তারপর ঘুম ভাঙিয়া গেল।

দেখিলাম, লেপটা কখন অসাবধানে নাকের উপর পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ঘর্মাক্ত কলেবরে বিছানায় বসিয়া রহিলাম, তারপর ঠাণ্ডা হইয়া আবার শয়ন করিলাম। চিন্তার সংসর্গ ঘুমের মধ্যেও কিরূপ বিচিত্রভাবে সঞ্চারিত হয় তাহা দেখিয়া হাসি পাইল।

ভোর হইতে না হইতে শিকারে বাহির হইবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কোনোমতে হাফ্-প্যান্ট ও গরম হোস্ চড়াইয়া লইয়া, কেক সহযোগে ফুটন্ত চা গলাধঃকরণ করিয়া

মোটরে চড়িলাম। মোটরে তিনটা শট-গান্, অজস্র কার্তুজ ও এক বেতের বাক্স-ভরা আহার্য দ্রব্য আগে হইতেই রাখা হইয়াছিল। কুমার ত্রিদিব ও আমরা দুইজন পিছনের সীটে ঠাসাঠাসি হইয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্ট শীতল ঊষালোকের ভিতর দিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

কুমার ওভারকোটের কলারের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'সূর্যোদয়ের আগে না পৌঁছুলে ময়ূর বনমোরগ পাওয়া শক্ত হবে। এই সময় তারা গাছের ডগায় বসে থাকে—চমৎকার টার্গেট।'

ক্রমে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পথের দুধারে সমতল ধানের ক্ষেত; কোথাও পাকা ধান শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও সোনালী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে আকাশের পটমূলে পুরু কালির দাগের মত বনানী দেখা গেল; আমাদের রাস্তা তাহার একটা কোণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুমার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে ঐ বনেই শিকার করিতে চলিয়াছি।

মিনিট কুড়ি পরে আমাদের মোটর জঙ্গলের কিনারায় আসিয়া থামিল। আমরা পকেটে কার্তুজ ভরিয়া লইয়া বন্দুক ঘাড়ে মহা উৎসাহে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। কুমার ত্রিদিব একদিকে গেলেন। আমি আর ব্যোমকেশ একসঙ্গে আর একদিকে চলিলাম। বন্দুক চালনায় আমার এই প্রথম হাতে খড়ি, তাই একলা যাইতে সাহস হইল না। ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে স্থির হইল যে বেলা ন'টার সময় বনের পূর্ব সীমান্তে ফাঁকা জায়গায় তিনজনে আবার পুনর্মিলিত হইব। সেইখানেই প্রাতরাশের ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রকাণ্ড বনের মধ্যে বড় বড় গাছ—শাল, মহুয়া, সেগুন, শিমুল, দেওদার—মাথার উপর যেন চাঁদোয়া টানিয়া দিয়াছে; তাহার মধ্যে অজস্র শিকার। নীচে হরিণ, খরগোশ—উপরে হরিয়াল, বনমোরগ, ময়ূর। প্রথম বন্দুক ধরিবার উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দ—আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষচূড়া হইতে মৃত পাখীর পতন-শব্দ, ছর্‌রার আঘাতে উড্ডীয়মান কুক্কুটের আকাশে ডিগ্‌বাজী খাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি—একটা এপিক লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছে। কালিদাস সত্যই লিখিয়াছেন, বিধান্তি লক্ষ্যে চলে—সঞ্চরমান লক্ষ্যকে বিদ্ধ করা—এরূপ বিনোদ আর কোথায়? কিন্তু যাক্—পাখী শিকারের বহুল বর্ণনা করিয়া প্রবীণ বাঘ-শিকারীদের কাছে আর হাস্যাস্পদ হইব না।

আমাদের থলি ক্রমে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বেলাও অলক্ষিতে বাড়িয়া চলিয়াছিল। আমি একবার এক কার্তুজে—দশ নম্বর—সাতটা হরিয়াল মারিয়া আত্মশ্লাঘার সপ্তমস্বর্গে চড়িয়া গিয়াছিলাম—দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল আমার মত অব্যর্থ সন্ধান সেকালে অর্জুনেরও ছিল না। ব্যোমকেশ দুইবার মাত্র বন্দুক চালাইয়া—একবার একটা খরগোশ ও দ্বিতীয়বার একটা ময়ূর মারিয়াই—থামিয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু বৃহত্তর শিকারের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। বনে হরিণ আছে; তা ছাড়া, বাঘ না হোক, ভাল্লুকের আশা সে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই যদিও মহুয়া গাছে তখনও ফল পাকে নাই তবু তাহার ভাল্লুক-লুব্ধ মন সেই দিকেই সতর্ক হইয়া ছিল।

কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, জঙ্গলের বাতাসের গুণে পেটের মধ্যে অগ্নিদেব ততই প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আমরা তখন জঙ্গলের পূর্বসীমা লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কুমার ত্রিদিবের বন্দুকের আওয়াজ দূর হইতে বরাবরই শুনিতে পাইতে-ছিলাম, এখন দেখিলাম তিনিও পূর্বদিকে মোড় লইয়াছেন।

বনভূমির ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে আমরা রৌদ্রোজ্জ্বল খোলা জায়গায় নীল আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখেই বালুকার একটা বিস্তীর্ণ বলয়—প্রায় সিকি মাইল চওড়া; দৈর্ঘ্যে কতখানি তাহা আন্দাজ করা গেল না—বনের কোল ঘেঁষিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে। বালুর উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া চক চক্ করিতেছে; শীতের প্রভাতে দেখিতে খুব চমৎকার লাগিল।

এই বালু-বলয় জঙ্গলকে পূর্বদিকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। কোনো সুদূর

অতীতে হয়তো ইহা একটি স্রোতস্বিনী ছিল, তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে– হয়তো ভূমিকম্পে—খাত উঁচু হইয়া জল শুকাইয়া গিয়া শুষ্ক বালুপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

আমরা বালুর কিনারায় বসিয়া সিগারেট ধরাইলাম।

অল্পকাল পরেই কুমার ত্রিদিব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'দিব্যি ক্ষিদে পেয়েছে—না? ঐ যে দুর্যোধন পৌঁছে গেছে—চলুন।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কুমার ত্রিদিবের উড়িয়া বাবুর্চি মোটর হইতে বাস্কেট নামাইয়া ইতিমধ্যে হাজির হইয়াছিল। অনতিদূরে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর সাদা তোয়ালে বিছাইয়া খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখিতে ছিল। তাহাকে দেখিয়া কুলায় প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখীর মত আমরা সেই দিকে ধাবিত হইলাম।

আহার করিতে করিতে, কে কি পাইয়াছে তাহার হিসাব হইল। দেখা গেল, আমার এক কার্তুজে সাতটা হরিয়াল সত্ত্বেও, কুমার বাহাদুরই জিতিয়া আছেন।

আকণ্ঠ আহার ও অনুপান হিসাবে থার্মোফ্লাস্ক হইতে গরম চা নিঃশেষ করিয়া আবার সিগারেট ধরানো গেল। কুমার ত্রিদিব গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া বসিলেন, সিগারেটে সুদীর্ঘ টান দিয়া অর্ধনিমীলিত চক্ষে কহিলেন, 'এই যে বালুবন্ধ দেখছেন এ থেকেই জমিদারীর নাম হয়েছে চোরাবালি। এদিকটা সব হিমাংশুর।' বলিয়া পূর্বদিক নির্দেশ করিয়া হাত নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম। এই বালির ফালিটা লম্বায় কতখানি? সমস্ত বনটাকেই ঘিরে আছে নাকি?'

কুমার বলিলেন, 'না। মাইল তিনেক লম্বা হবে—তারপরে আমার মাঠ আরম্ভ হয়েছে। এরই মধ্যে কোথায় এক জায়গায় খানিকটা চোরাবালি আছে—ঠিক কোন্‌খানটায় আছে কেউ জানে না, কিন্তু ভয়ে কোনো মানুষ বালির উপর দিয়ে হাঁটে না; এমন কি গরু বাছুর শেয়াল কুকুর পর্যন্ত একে এড়িয়ে চলে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বালিতে কোথাও জল নেই বোধহয়?'

কুমার অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িলেন, 'বলতে পারি না। শুনেছি ঐদিকে খানিকটা জায়গায় জল আছে, তাও সব সময় পাওয়া যায় না।' বলিয়া দক্ষিণ দিকে যেখানে বালুর রেখা বাঁকিয়া বনের আড়ালে অদৃশ্য হইয়াছে সেই দিকে আঙুল দেখাইলেন।

এই সময় হঠাৎ অতি নিকটে বনের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমরা তিনজনেই এখানে রহিয়াছি, তবে কে আওয়াজ করিল—বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময় একজন বন্দুকধারী লোক একটা মৃত খরগোশ কান ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিধানে যোধপুরী ব্রীচেস্‌, মাথায় বয়-স্কাউটের মত খাকি টুপি, চামড়ার কোমরবন্ধে সারি সারি কার্তুজ আঁটা রহিয়াছে।

কুমার ত্রিদিব উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'আরে হিমাংশু, এস এস।'

খরগোশ মাটিতে ফেলিয়া হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন; বলিলেন, 'অভ্যর্থনা আমারই করা উচিত এবং করছিও। বিশেষতঃ এঁদের।' কুমার আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন, তারপর হাসিয়া হিমাংশুবাবুকে বলিলেন, 'তুমি বুঝি আর লোভ সামলাতে পারলে না? কিম্বা ভয় হল, পাছে তোমার সব বাঘ আমরা ব্যাগ করে ফেলি?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আরে বল কেন? মহা ফ্যাসাদে পড়া গেছে। আজই আমার ত্রিপুরায় যাবার কথা ছিল, সেখান থেকে শিকারের নেমন্তন্ন পেয়েছি। কিন্তু যাওয়া হল না, দেওয়ানজী আটকে দিলেন। বাবার আমলের লোক, একটু ছুতো পেলেই জুলুম জবরদস্তি করেন, কিছু বলতেও পারি না। তাই রাগ করে আজ সকালবেলা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। দুত্তোর! কিছু না হোক দুটো বনপায়রাও তো মারা যাবে!'

কুমার বলিলেন, 'হায় হায়—কোথায় বাঘ ভাল্লুক আর কোথায় বনপায়রা! দুঃখ হবার কথা বটে—কিন্তু যাওয়া হল না কেন?'

হিমাংশুবাবু ইতিমধ্যে খাবার বাক্সটা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া তাহার ভিতর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, প্রফুল্লমুখে কয়েকটা ডিম-সিদ্ধ ও কাটলেট বাহির করিয়া চর্বণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি এই অবসরে তাঁহার চেহারাখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। বয়স আমাদেরই সমান হইবে; বেশ মজবুত পেশীপুষ্ট দেহ। মুখে একজোড়া উগ্র জার্মান গোঁফ মুখখানাকে অনাবশ্যক রকম হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে পুরাতন বাঘ-শিকারীর নিষ্ঠুর সতর্কতা সর্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। এক নজর দেখিলে মনে হয় লোকটা ভীষণ দুর্দান্ত। কিন্তু তবু বর্তমানে তাঁহাকে পরম পরিতৃপ্তির সহিত অর্ধমুদিত নেত্রে কাটলেট চিবাইতে দেখিয়া আমার মনে হইল, চেহারাটাই তাঁহার সত্যকার পরিচয় নহে; বস্তুতঃ লোকটি অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর—মনের মধ্যে কোনো মারপ্যাঁচ নাই। সাংসারিক বিষয়ে হয়তো একটু অন্যমনস্ক; নিদ্রায় জাগরণে নিরন্তর বাঘ ভাল্লুকের কথা চিন্তা করিয়া বোধ করি বুদ্ধিটাও সাংসারিক ব্যাপারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

কাটলেট ও ডিম্ব সমাপনান্তে চায়ের ফ্লাস্কে চুমুক দিয়া হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'কি বললে? যাওয়া হল না কেন? নেহাত বাজে কারণ; কিন্তু দেওয়ানজী ভয়ানক ভাবিত হয়ে পড়েছেন, পুলিসকেও খবর দেওয়া হয়েছে। কাজেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাকে এখানে ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হবে।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

'হয়েছে কি?'

'হয়েছে আমার মাথা। জান তো, বাবা মারা যাবার পর থেকে গত পাঁচ বছর ধরে প্রজাদের সঙ্গে অনবরত মামলা মোকদ্দমা চলছে। আদায় তসিলও ভাল হচ্ছে না। এই নিয়ে অষ্টপ্রহর অশান্তি লেগে আছে;—উকিল মোক্তার পরামর্শ, সে সব তো তুমি জানোই। যাহোক আমমোক্তারনামা দিয়ে এক রকম নিশ্চিন্দি হওয়া গিছল, এমন সময় আবার এক নূতন ফ্যাচাং—। মাস-কয়েক আগে বেবির জন্য একটা মাস্টার রেখেছিলুম, সে হঠাৎ পরশু দিন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে; যাবার সময় নাকি খানকয়েক পুরনো হিসেবের খাতা নিয়ে গেছে। তাই নিয়ে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড। থানা পুলিস হৈ হৈ রৈ রৈ বেধে গেছে। দেওয়ানজীর বিশ্বাস, এটা আমার মামলাবাজ প্রজাদের একটা মারাত্মক প্যাঁচ।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'লোকটা এখনো ধরা পড়েনি?'

বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'না। এবং যতক্ষণ না ধরা পড়ছে—' হঠাৎ থামিয়া গিয়া কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আরে! এটা এতক্ষণ আমার মাথাতেই ঢোকেনি। আপনি তো একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ, চোর ডাকাতের সাক্ষাৎ যম! (ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে বলিল, সত্যান্বেষী) তাহলে মশায়, দয়া করে যদি দু'একদিনের মধ্যে লোকটাকে খুঁজে বার করে দিতে পারেন—তাহলে আমার ত্রিপুরার শিকারটা ফস্কায় না। কাল-পরশুর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে—'

আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'চোরের মন পুঁই আদাড়ে। তুমি বুঝি কেবল শিকারের কথাই ভাবছ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাকে কিছু করতে হবে না, পুলিসই খুঁজে বার করবে অখন। এসব জায়গা থেকে একেবারে লোপাট হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; কলকাতা হলেও বা কথা ছিল।'

হিমাংশুবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'পুলিসের কর্ম নয়। এই তিন দিনে সমস্ত দেশটা তারা তোলপাড় করে ফেলেছে, কাছাকাছি যত রেলওয়ে স্টেশন আছে সব জায়গায় পাহারা বসিয়েছে। কিন্তু এখনো তো কিছু করতে পারলে না। দোহাই ব্যোমকেশবাবু, আপনি কেসটা হাতে নিন; সামান্য ব্যাপার, আপনার দু'ঘণ্টাও সময় লাগবে না।'

ব্যোমকেশ তাঁহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'আচ্ছা, ঘটনাটা আগাগোড়া বলুন তো শুনি।'

হিমাংশুবাবু সাক্ষাতে হাত উল্টাইয়া বলিলেন 'আমি কি সব জানি ছাই! তার সঙ্গে বোধহয় সাকুল্যে পাঁচ দিনও দেখা হয়নি। যা হোক, যতটুকু জানি বলছি শুনুন। কিছুদিন

আগে—বোধহয় মাস দুই হবে—একদিন সকালবেলা একটা ন্যালাখ্যাপা গোছের ছোকরা আমার কাছে এসে হাজির হল। তাকে আগে কখনো দেখিনি, এ অঞ্চলের লোক বলে বোধ হল না। তার গায়ে একটা ছেঁড়া কামিজ, পায়ে ছেঁড়া চটিজুতা—রোগা বেঁটে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চেহারা; কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হয় শিক্ষিত। বললে, চাকরীর অভাবে খেতে পাচ্ছে না, যা হোক একটা চাকরী দিতে হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ করতে পার? পকেট থেকে বি-এস্‌সি'র ডিগ্রি বার করে দেখিয়ে বললে, যে কাজ দেবেন তাই করব। ছোকরার অবস্থা দেখে আমার একটু দয়া হল, কিন্তু কি কাজ দেব? সেরেস্তায় তো একটা জায়গাও খালি নেই। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, আমার মেয়ে বেবির জন্যে একজন মাস্টার রাখবার কথা গিন্নি কয়েকদিন আগে বলেছিলেন। বেবি এই সাতে পড়েছে, সুতরাং তার পড়াশুনোর দিকে এবার একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

'তাকে মাস্টার বাহাল করলুম, কারণ, অবস্থা যাই হোক, ছোকরা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। বাড়িতেই বাইরের একটা ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলুম। ছোকরা কৃতজ্ঞতায় একেবারে কেঁদে ফেললে। তখন কে ভেবেছিল যে—; নাম? নাম যতদূর মনে পড়ছে, হরিনাথ চৌধুরী—কায়স্থ।

'যা হোক, সে বাড়িতেই রইল। কিন্তু আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হত না। বেবিকে দুবেলা পড়াচ্ছে, এই পর্যন্তই জানতুম। হঠাৎ সেদিন শুনলুম, ছোকরা কাউকে না বলে কবে উধাও হয়েছে। উধাও হয়েছে, হয়েছে—আমার কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু মাঝ থেকে কতকগুলো বাজে পুরনো হিসেবের খাতা নিয়ে গিয়েই আমার সর্বনাশ করে গেল। এখন তাকে খুঁজে বার না করা পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই।'

হিমাংশুবাবু নীরব হইলেন। ব্যোমকেশ ঘাসের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া শুনিতেছিল, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ছোকরা খেত কোথায়?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আমার বাড়িতেই খেত। আদর যত্নের ত্রুটি ছিল না, বেবির মাস্টার বলে গিন্নি তাকে নিজে—'

এই সময় পিছনে একটা গাছের মাথায় ফট্‌ ফট্‌ শব্দ শুনিয়া আমরা মাথা তুলিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড বন-মোরগ নানা বর্ণের পুচ্ছ ঝুলাইয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যাইতেছে। গাছ দুটার মধ্যে ব্যবধান ত্রিশ হাতের বেশী হইবে না। কিন্তু নিমিষের মধ্যে বন্দুকের ব্রীচ্‌ খুলিয়া টোটা ভরিয়া হিমাংশুবাবু ফায়ার করিলেন। পাখীটা অন্য গাছ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না, মধ্য পথেই ধপ্‌ করিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, 'কি অদ্ভুত টিপ্‌।'

ব্যোমকেশ সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিল, 'সত্যিই অসাধারণ।'

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'ও আর কি দেখলেন? ওর চেয়েও ঢের বেশী আশ্চর্য বিদ্যে ওর পেটে আছে!—হিমাংশু, তোমার সেই শব্দভেদী প্যাঁচটা একবার দেখাও না।'

'আরে না না, এখন ওসব থাক। চল—আর একবার জঙ্গলে ঢোকা যাক—'

'সে হচ্ছে না—ওটা দেখাতেই হবে। নাও—চোখে রুমাল বাঁধো।'

হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'কি ছেলেমানুষী দেখুন দেখি। ও একটা বাজে ট্রীক্‌, আপনারা কতবার দেখেছেন—'

আমরাও কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলাম, বলিলাম, 'তা হোক, আপনাকে দেখাতে হবে।'

তখন হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা—দেখাচ্ছি। কিছুই নয়, চোখ বেঁধে কেবল শব্দ শুনে লক্ষ্যবেধ করা।' বন্দুকে একটা বুলেট ভরিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনিই রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে দিন—কিন্তু দেখবেন কান দুটো যেন খোলা থাকে।'

ব্যোমকেশ রুমাল দিয়া বেশ শক্ত করিয়া তাঁহার চোখ বাঁধিয়া দিল। তখন কুমার ত্রিদিব একটা চায়ের পেয়ালা লইয়া তাহার হাতলে খানিকটা সুতা বাঁধিলেন। তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া—যাহাতে হিমাংশুবাবু বুঝিতে না পারেন তিনি কোনদিকে গিয়াছেন—প্রায়

পঁচিশ হাত দূরে একটা গাছের ডালে পেয়ালাটা ঝুলাইয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হিমাংশুবাবু এবার শুনুন।'

কুমার ত্রিদিব চামচ দিয়া পেয়ালাটায় আঘাত করিলেন, ঠং করিয়া শব্দ হইল।

হিমাংশুবাবু বন্দুক কোলে লইয়া যেদিক হইতে শব্দ আসিল সেই দিকে ঘুরিয়া বসিলেন। বন্দুকটা একবার তুলিলেন, তারপর বলিলেন, 'আর একবার বাজাও।'

কুমার ত্রিদিব আর একবার শব্দ করিয়া ক্ষিপ্রপদে সরিয়া আসিলেন।

শব্দের রেশ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবার পূর্বেই বন্দুকের আওয়াজ হইল; দেখিলাম পেয়ালাটা চূর্ণ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, কেবল তাহার ডাঁটিটা ডাল হইতে ঝুলিতেছে।

মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পেশাদার বাজীকরের সাজানো নাট্যমঞ্চে এরকম খেলা দেখা যায় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক রকম জুয়াচুরি আছে। এ একেবারে নির্জলা খাঁটি জিনিস।

হিমাংশুবাবু চোখের রুমাল খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'হয়েছে?'

আমাদের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা শুনিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'ও কথা থাক, আপনাদের সুখ্যাতি আর বেশীক্ষণ শুনলে আমার গন্ডদেশ ক্রমে বিলাতি বেগুনের মত লাল হয়ে উঠবে। এখন উঠুন। চলুন, ইতর প্রাণীদের বিরুদ্ধে আর একবার অভিযানে বেরুনো যাক।'

বেলা দেড়টার সময়, শিকার-শ্রান্ত চারিজন মোটরের কাছে ফিরিয়া আসিলাম। হরিনাথ মাস্টারের খাতা চুরির কাহিনী চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। হিমাংশুবাবুরও কি জানি কেন, ব্যোমকেশের সাহায্য লইবার আর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বোধহয় এরূপ তুচ্ছ ব্যাপারে সদ্য পরিচিত একজন লোককে খাটাইয়া লইতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেছিলেন; হয়তো তিনি ভাবিতেছিলেন যে পুলিসই শীঘ্র এই ব্যাপারের একটা সমাধান করিয়া ফেলিবে। সে যাহাই হোক, ব্যোমকেশই প্রসঙ্গটার পুনরুত্থাপন করিল, বলিল, 'আপনার হরিনাথ মাস্টারের গল্পটা ভাল করে শোনা হল না।'

হিমাংশুবাবু মোটরের ফুট-বোর্ডে পা তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি যা জানি সবই প্রায় বলেছি, আর বিশেষ কিছু জানবার আছে বলে মনে হয় না।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'চল হিমাংশু, তোমাকে মোটরে বাড়ি পেঁছে দিয়ে যাই। তুমি বোধ হয় হেঁটেই এসেছ।'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। তবে রাস্তা দিয়ে ঘুর পড়ে বলে ওদিক দিয়ে মাঠে মাঠে এসেছি। ওদিক দিয়ে মাইলখানেক পড়ে।' বলিয়া দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'রাস্তা দিয়ে অন্তত মাইল দুই। চল তোমাকে পৌঁছে দিই।' তারপর হাসিয়া বলিলেন, 'আর যদি নেমন্তন্ন কর তাহলে না হয় দুপুরের স্নানাহারটা তোমার বাড়িতেই সারা যাবে। কি বলেন আপনারা?'

আমাদের কোনো আপত্তিই ছিল না, আমোদ করিতে আসিয়াছি, গৃহস্বামী যেখানে লইয়া যাইবেন সেখানে যাইতেই রাজী ছিলাম। আমরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়—সে আর বলতে। তোমরা তো আজ আমারই অতিথি—এতক্ষণ এ প্রস্তাব না করাই আমার অন্যায় হয়েছে। যা হোক, উঠে পড়ুন গাড়িতে, আর দেরী নয়; খাওয়া দাওয়া করে তবু একটু বিশ্রাম করতে পারেন। তারপর একেবারে বৈকালিক চা সেরে বাড়ি ফিরলেই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এবং পারি যদি, ইতিমধ্যে আপনার পলাতক মাস্টারের একটা ঠিকানা করা যাবে।'

'হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে। আমার দেওয়ান হয়তো তার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলতে পারবেন।' বলিয়া তিনি নিজে অগ্রবর্তী হইয়া গাড়িতে উঠিলেন।

হিমাংশুবাবু খুবই সমাদর সহকারে আমাদের আহ্বান করিলেন বটে কিন্তু তবু আমার একটা ক্ষীণ সন্দেহ জাগিতে লাগিল যে তিনি মন খুলিয়া খুশী হইতে পারেন নাই।

দশ মিনিট পরে আমাদের গাড়ি তাঁহার প্রকাণ্ড উদ্যানের লোহার ফটক পার হইয়া প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ির শব্দে একটি প্রৌঢ় গোছের ব্যক্তি ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর হিমাংশুবাবুকে গাড়ি হইতে নামিতে দেখিয়া তিনি খড়ম পায়ে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা হিমাংশু, যা ভেবেছিলুম তাই। হরিনাথ মাস্টার শুধু খাতাই চুরি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে তহবিল থেকে ছ'হাজার টাকাও গেছে।'

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। শীতের অপরাহ্ণ ইহারই মধ্যে দিবালোকের উজ্জ্বলতা ম্লান করিয়া আনিয়াছিল।

'এবার ভট্টাচার্যি মশায়ের মুখে ব্যাপারটা শোনা যাক।' বলিয়া ব্যোমকেশ মোটা তাকিয়ার উপর কনুই ভর দিয়া বসিল।

গুরু ভোজনের পর বৈঠকখানায় গদির উপর বিস্তৃত ফরাসের শয্যায় এক একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া আমরা চারিজনে গড়াইতেছিলাম। হিমাংশুবাবুর কন্যা বেবি ব্যোমকেশের কোলের কাছে বসিয়া নিবিষ্ট মনে একটা পুতুলকে কাপড় পরাইতেছিল; এই দুই ঘণ্টায় তাহাদের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল। দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য মহাশয় একটু তফাতে ফরাসের উপর মেরুদণ্ড সিধা করিয়া পদ্মাসনে বসিয়াছিলেন—যেন একটু সুবিধা পাইলেই ধ্যানস্থ হইয়া পড়িবেন।

বস্তুতঃ তাঁহাকে দেখিলে জপতপ ধ্যানধারণার কথাই বেশী করিয়া মনে হয়। আমি তো প্রথম দর্শনে তাঁহাকে জমিদার বাড়ির পুরোহিত বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। শীর্ণ গৌরবর্ণ দেহ, মুণ্ডিত মুখ, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে আধুলির মত একটি সিন্দুরের টিকা। মুখে তপঃকৃশ শান্তির ভাব। বৈষয়িকতার কোনো চিহ্নই সেখানে বিদ্যমান নাই। অথচ এক শিকার-পাগল সংসার-উদাসী জমিদারের বৃহৎ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা যে এই লোকটির তীক্ষ্ণ সতর্কতার উপর নির্ভর করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মান্য অতিথির সংবর্ধনা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারীর সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত ইঁহারি কটাক্ষ ইঙ্গিতে সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

ব্যোমকেশের কথায় তিনি নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ক্ষণকাল মুদিত চক্ষে নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হরিনাথ লোকটা আপাতদৃষ্টিতে এতই সাধারণ আর অকিঞ্চিৎকর যে তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনে হয় বলবার কিছুই নেই। ন্যালা-ক্যাব্‌লা গোছের একটা ছোঁড়া—অথচ তার পেটে যে এতখানি শয়তানী লুকোনো ছিল তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আমি মানুষ চিনতে বড় ভুল করি না, এক নজর দেখেই কে কেমন লোক বুঝতে পারি। কিন্তু সে-ছোঁড়া আমার চোখেও ধুলো দিয়েছে। একবারও সন্দেহ করিনি যে এটা তার ছদ্মবেশ, তার মনে কোনো কু-অভিপ্রায় আছে।

'প্রথম যেদিন এল সেদিন তার জামাকাপড়ের দুরবস্থা দেখে আমি ভাণ্ডার থেকে দু'জোড়া কাপড় দুটো গেঞ্জি দুটো জামা আর দু'খানা কম্বল বার করে দিলুম। একখানা ঘর হিমাংশু বাবাজী তাকে আগেই দিয়েছিলেন—ঘরটাতে পুরনো খাতাপত্র থাকত, তা ছাড়া বিশেষ কোনো কাজে লাগত না; সেই ঘরে তক্তপোষ ঢুকিয়ে তার শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। ঠিক হল, বেবি দু'বেলা ঐ ঘরেই পড়বে। তার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমি স্থির করেছিলুম, অনাদি সরকারের কিম্বা কোনো আমলার বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসবে। আমলারা সবাই কাছেপিঠেই থাকে। কিন্তু আমাদের মা-লক্ষ্মী সে প্রস্তাবে মত দিলেন না। তিনি অন্দর থেকে বলে পাঠালেন যে বেবির মাস্টার বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করবে। সেই ব্যবস্থাই ধার্য হল।

'তারপর সে বেবিকে নিয়মিত পড়াতে লাগল। আমি দু'দিন তার পড়ানো লক্ষ্য করলুম—দেখলুম ভালই পড়াচ্ছে। তারপর আর তার দিকে মন দেবার সুযোগ হয়নি। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসত—ধর্ম সম্বন্ধে দু'চার কথা শুনতে চাইত। এমনিভাবে দু'মাস কেটে গেল।

'গত শনিবার আমি সন্ধ্যের পরই বাড়ি চলে যাই। আমি যে-বাড়িতে থাকি দেখেছেন বোধ হয়—ফটকে ঢুকতে ডান দিকে যে হলদে বাড়িখানা পড়ে সেইটে। কয়েক মাস হল আমি আমার স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি।—একলাই থাকি। স্বপাক খাই—আমার কোনো কষ্ট হয় না। শনিবার রাত্রে আমার পুরশ্চরণ করবার কথা ছিল—তাই সকাল সকাল গিয়ে উদ্যোগ আয়োজন করে পুজোয় বসলুম। উঠতে অনেক রাত হয়ে গেল।

'পরদিন সকালে এসে শুনলুম মাস্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমে বেলা বারোটা বেজে গেল তখনো মাস্টারের দেখা নেই। আমার সন্দেহ হল, তার ঘরে গিয়ে দেখলুম রাত্রে সে বিছানায় শোয়নি। তখন, যে আলমারিতে জমিদারীর পুরনো হিসেবের খাতা থাকে সেটা খুলে দেখলুম—গত চার বছরের হিসেবের খাতা নেই।

'গত চার বছর থেকে অনেক বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা চলছে; সন্দেহ হল এ তাদেরই কারসাজি। জমিদারীর হিসেবের খাতা শত্রুপক্ষের হাতে পড়লে তাদের অনেক সুবিধা হয়; বুঝলুম, হরিনাথ তাদেরই গুপ্তচর, মাস্টার সেজে জমিদারীর জরুরী দলিল চুরি করবার জন্যে এসে ঢুকেছিল।

'পুলিসে খবর পাঠালুম। কিন্তু তখনো জানি না যে সিন্দুক থেকে ছ' হাজার টাকাও লোপাট হয়েছে।'

এ পর্যন্ত বলিয়া দেওয়ানজী থামিলেন, তারপর ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'নানা কারণে কিছুদিন থেকে তহবিলে টাকার কিছু টানাটানি পড়েছে। সম্প্রতি মোকদ্দমার খরচ ইত্যাদি বাবদ কিছু টাকার দরকার হয়েছিল, তাই মহাজনের কাছ থেকে ছ' হাজার টাকা হাওলাত নিয়ে সিন্দুকে রাখা হয়েছিল। টাকাটা পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় সিন্দুকের এক কোণে রাখা ছিল। ইতিমধ্যে অনেকবার সিন্দুক খুলেছি কিন্তু পুঁটলি খুলে দেখবার কথা একবারও মনে হয়নি। আজ সদর থেকে উকিল টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। পুঁটলি খুলে টাকা বার করতে গেলুম; দেখি, নোটের তাড়ার বদলে কতকগুলো পুরনো খবরের কাগজ রয়েছে।'

দেওয়ান নীরব হইলেন।

শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ আবার চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'তাহলে সিন্দুকের তালা ঠিকই আছে? চাবি কার কাছে থাকে?'

দেওয়ান বলিলেন, 'সিন্দুকের দুটো চাবি; একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা হিমাংশু বাবাজীর কাছে। আমার চাবি ঠিকই আছে, কিন্তু হিমাংশু বাবাজীর চাবিটা শুনছি ক'দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

হিমাংশুবাবু শুষ্কমুখে বলিলেন, 'আমারই দোষ। চাবি আমার কোনোকালে ঠিক থাকে না, কোথায় রাখি ভুলে যাই। এবারেও কয়েকদিন থেকে চাবিটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু সেজন্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইনি—ভেবেছিলুম কোথাও না কোথাও আছেই—'

'হুঁ'—ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, হাসিয়া বেবিকে নিজের কোলের উপর বসাইয়া বলিল, মা-লক্ষ্মীর মাস্টারটি জুটেছিল ভাল। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই আশ্চর্য। ভাল করে খোঁজ করা হচ্ছে তো?'

দেওয়ান কালীগতি বলিলেন, 'যতদূর সাধ্য ভাল করেই খোঁজ করানো হচ্ছে। পুলিস তো আছেই, তার ওপর আমিও লোক লাগিয়েছি। কিন্তু কোনো সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না।'

বেবি পুতুল রাখিয়া ব্যোমকেশের গলা জড়াইয়া ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার মাস্টারমশাই কবে ফিরে আসবেন?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'জানি না। বোধ হয় আর আসবেন না।'

বেবির চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল; তাহা দেখিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি মাস্টারমশাইকে খুব ভালবাসো—না?'

বেবি ঘাড় নাড়িল—'হ্যাঁ—খুব ভালবাসি। তিনি আমাকে কত অঙ্ক শেখাতেন।—আচ্ছা বল তো, সাত-নাম্ কত হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কত? চৌষট্টি?'

বেবি বলিল, 'দুৎ! তুমি কিচ্ছু জান না। সাত-নাম্ তেষট্টি। আচ্ছা, তুমি মা কালীর স্তব জানো?'

ব্যোমকেশ হতাশ ভাবে বলিল, 'না। মা কালীর স্তবও কি তোমার মাস্টারমশায় শিখিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ—শুনবে?' বলিয়া বেবি সুর করিয়া আরম্ভ করিল—

'নমস্তে কালিকা দেবী করাল বদনী—'

কালীগতি ঈষদ্‌হাস্যে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'বেবি, তোমার কালীস্তব আমরা পরে শুনব, এখন তুমি বাগানে খেলা কর গে যাও।'

বেবি একটু ক্ষুণ্ণভাবে পুতুল লইয়া প্রস্থান করিল। কালীগতি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'লোকটা মাস্টার হিসেবে মন্দ ছিল না—বেশ যত্ন করে পড়াত—অথচ—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'চলুন, মাস্টারের ঘরটা একবার দেখে আসা যাক।'

বাড়ির সম্মুখস্থ লম্বা বারান্দার একপ্রান্তে একটি প্রকোষ্ঠ; দ্বারে তালা লাগানো ছিল, দেওয়ানজী কষি হইতে চাবির গুচ্ছ বাহির করিয়া তালা খুলিয়া দিলেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ঘরটি আয়তনে ছোট। গোটা-দুই কাঠের কবাটযুক্ত আলমারি, টেবিল চেয়ার তক্তপোষেই এমনভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে যে মনে হয় পা বাড়াইবার স্থান নাই। দ্বারের বিপরীত দিকে একটা ছোট জানালা ছিল, সেটা খুলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইল। তক্তপোষের উপর বিছানাটা অবিনাস্ত ভাবে পাট করা রহিয়াছে; টেবিলের উপর সূক্ষ্ম একপুরু ধুলার প্রলেপ পড়িয়াছে; ঘরের অন্ধকার একটা কোণে দড়ি টাঙাইয়া কাপড়-চোপড় রাখিবার ব্যবস্থা। একটা আলমারির কবাট ঈষৎ উন্মুক্ত। দেওয়ালে লম্বিত একখানি কালীঘাটের পটের কালীমূর্তি হরিনাথ মাস্টারের কালীপ্রীতির পরিচয় দিতেছে।

ব্যোমকেশ তক্তপোষের নীচে উঁকি মারিয়া একজোড়া জুতা টানিয়া বাহির করিল, বলিল, 'তাই তো, জুতোজোড়া যে একেবারে নূতন দেখছি। ও—আপনারাই কিনে দিয়েছিলেন বুঝি?'

কালীগতি বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! আশ্চর্য!' জুতা রাখিয়া দিয়া ব্যোমকেশ দড়ির আলনাটার দিকে গেল। আলনায় কয়েকটা কাচা আকাচা কাপড় জামা ঝুলিতেছিল, সেগুলিকে তুলিয়া তুলিয়া দেখিল, তারপর আবার বলিল, 'ভারি আশ্চর্য!'

হিমাংশুবাবু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে?'

জবাব দিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল, তাহার দৃষ্টি ঘরের বিপরীত কোণে একটা কুলুঙ্গির উপর গিয়া পড়িল। সে দ্রুতপদে গিয়া কুলুঙ্গির ভিতর হইতে কি একটা তুলিয়া লইয়া জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সবিস্ময়ে বলিল, 'মাস্টার কি চশমা পরত?'

কালীগতি বলিলেন, 'ওটা বলতে ভুল হয়ে গেছে—পরত বটে। চশমা কি ফেলে গেছে নাকি?'

চশমার কাচের ভিতর দিয়া একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া সহাস্যে সেটা আমার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ—আশ্চর্য নয়?'

কালীগতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আশ্চর্য বটে। কারণ যার চোখ খারাপ তার পক্ষে চশমা ফেলে যাওয়া অস্বাভাবিক। এর কি কারণ হতে পারে

আপনার মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। হয়তো তার সত্যি চোখ খারাপ ছিল না, আপনাদের ঠকাবার জন্যে চশমা পরত।'

ইতাবসরে আমি আর কুমার ত্রিদিব চশমাটা পরীক্ষা করিতেছিলাম। স্টীল ফ্রেমের নড়বড়ে বাহুযুক্ত চশমা, কাচ পুরু। কাচের ভিতর দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার অনুমান বোধ হয় ঠিক নয়। চশমাটা অনেকদিনের ব্যবহারে পুরনো হয়ে গেছে, আর কাচের শক্তিও খুব বেশী।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার ভুলও হতে পারে। তবে, মাস্টার আর কারুর পুরনো চশমা নিয়ে এসেছিল এটাও তো সম্ভব। যা হোক, এবার আলমারিটা দেখা যাক।'

খোলা আলমারিটার কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে থাকে থাকে খেরো-বাঁধানো স্থূলকায় হিসাবের খাতা সাজানো রহিয়াছে—বোধহয় সবসুদ্ধ পঞ্চাশ-ষাট খানা। ব্যোমকেশ উপরের একটা খাতা নামাইয়া দু'হাতে ওজন করিয়া বলিল, 'বেশ ভারী আছে, সের চারেকের কম হবে না। প্রত্যেক খাতায় বুঝি এক বছরের হিসেব আছে?'

কালীগতি বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ খাতার গোড়ার পাতা উল্টাইয়া দেখিল, পাঁচ বছর আগেকার খাতা, ইহার পর হইতে শেষ চার বছরের খাতা চুরি গিয়াছে। আরো কয়েকখানা খাতা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ হিসাব রাখিবার প্রণালী মোটামুটি চোখ বুলাইয়া দেখিল। প্রত্যেকটি খাতা দুই অংশে বিভক্ত—অর্থাৎ একাধারে জাব্দা ও পাকা খাতা। এক অংশে দৈনন্দিন খুচরা আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখিত হইয়াছে—অন্য অংশে মোট দৈনিক খরচ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ জমিদারী খাতা এরূপভাবে লিখিত হয় না, কিন্তু এরূপ লেখার সুবিধা এই যে অল্প পরিশ্রমে জাব্দা ও পাকা খাতা মিলাইয়া দেখা যায়।

গোড়া হইতে ব্যোমকেশ ব্যাপারটাকে খুব হাল্কাভাবে লইয়াছিল। অতি সাধারণ গতানুগতিক চুরি ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোনো বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বোধ হয় সে মনে করে নাই। কিন্তু ঘর পরীক্ষা শেষ করিয়া যখন সে বাহিরে আসিল তখন দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। ও দৃষ্টি আমি চিনি। কোথাও সে একটা গুরুতর কিছুর ইঙ্গিত পাইয়াছে; হয়তো যত তুচ্ছ মনে করা গিয়াছিল ব্যাপার তত তুচ্ছ নয়। আমিও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম।

ঘরের বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হিমাংশুবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি এ ব্যাপারের তদন্ত করি আপনি চান?'

মুহূর্তকালের জন্য হিমাংশুবাবু যেন একটু দ্বিধা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'হ্যাঁ—চাই বই কি। এতগুলো টাকা, তার একটা কিনারা হওয়া তো দরকার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আমাদের দু'জনকে এখানে থাকতে হয়।'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। সে আর বেশী কথা কি—'

ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কিন্তু কুমার বাহাদুর যদি অনুমতি দেন তবেই আমরা থাকতে পারি। আমরা ওঁর অতিথি।'

কুমার ত্রিদিব লজ্জায় পড়িলেন। আমাদের ছাড়িবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না কিন্তু ব্যোমকেশের ইচ্ছাটাও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন। ব্যোমকেশ হিমাংশুবাবুর কাজ করিয়া কিছু উপার্জন করিতে চায় এরূপ সন্দেহও হয়তো তাঁহার মনে জাগিয়া থাকিবে। তাই তিনি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'বেশ তো, আপনারা থাকলে যদি হিমাংশুর উপকার হয়—'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা বলতে পারি না। হয়তো কিছুই করে উঠতে পারবো না। হিমাংশুবাবু, আপনার যদি এ বিষয়ে আগ্রহ না থাকে তো বলুন—চক্ষুলজ্জা করবেন না। আমরা কুমার ত্রিদিবের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি, বিষয়চিন্তাও কলকাতায় ফেলে এসেছি। তাই আপনি যদি আমার সাহায্য দরকার না মনে করেন, তাহলে আমি বরঞ্চ খুশীই হব।'

ব্যোমকেশ কুমার বাহাদুরের ভিত্তিহীন সন্দেহটার আভাস পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি আরো লজ্জিত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'না না ব্যোমকেশবাবু, আপনারা থাকুন। যতদিন দরকার থাকুন। আপনারা থাকলে নিশ্চয় এ ব্যাপারের কিনারা করতে পারবেন। আমি রোজ এসে আপনাদের খবর নিয়ে যাব।'

হিমাংশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন করিলেন। আমাদের থাকাই স্থির হইয়া গেল।

অতঃপর চায়ের ডাক পড়িল; আমরা বৈঠকখানায় ফিরিয়া গেলাম। প্রায় নীরবেই চা পান সমাপ্ত হইল। কুমার ত্রিদিব ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'সাড়ে চারটে বাজে। হিমাংশু, আমি তাহলে আজ চলি। কাল আবার কোনো সময় আসব।' বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

কম্পাউন্ডের বাহিরে মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। আমি এবং ব্যোমকেশ কুমারের সঙ্গে ফটক পর্যন্ত গেলাম। কুমার বাহাদুর নিজের জমিদারীতে আমাদের জন্য অনেক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন—পুকুরে মাছ ধরা, খালে নৌ বিহার প্রভৃতি বহুবিধ ব্যসনের আয়োজন হইয়াছিল। সে সব ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় তিনি একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। মোটরের কাছে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কাজটায় আপনার কতদিন লাগবে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছুই এখনো বলতে পারছি না—আপনি আমাকে ঘোর অকৃতজ্ঞ মনে করছেন, মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর—আমোদ-আহ্লাদের অছিলায় একে উপেক্ষা করলে অন্যায় হবে।'

কুমার বাহাদুর সচকিত হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি! কিন্তু আমার তো অতটা মনে হল না। অবশ্য অনেকগুলো টাকা গেছে—'

'টাকা যাওয়াটা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।'

'তবে?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার বিশ্বাস হরিনাথ মাস্টার বেঁচে নেই।'

আমরা দু'জনেই চমকিয়া উঠিলাম। কুমার বলিলেন, 'সে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই মনে হচ্ছে। আশা করি একথা শোনবার পর আমাকে সহজে ক্ষমা করতে পারবেন।'

কুমার উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন, 'না না, ক্ষমার কোনো কথাই উঠছে না। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। একটা লোক যদি খুন হয়ে থাকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনই হয়েছে এমন কথা আমি বলছি না। তবে সে বেঁচে নেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যা হোক, ও আলোচনা আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মুলতুবি থাক। আপনি কাল আসবেন তো? তাহলে আমাদের সুটকেসগুলোও সঙ্গে করে আনবেন। আচ্ছা—আজ বেরিয়ে পড়ুন—পৌঁছুতে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

কুমারের মোটর বাহির হইয়া যাইবার পর আমরা বাড়ির দিকে ফিরিলাম। ফটক হইতে বাড়ির সদর প্রায় একশত গজ দূরে, মধ্যের বিস্তৃত ব্যবধান নানা জাতীয় ছোট বড় গাছপালায় পূর্ণ। মাঝে মাঝে লোহার বেঞ্চি পাতিয়া বিশ্রামের স্থান করা আছে।

দেওয়ানের ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ি দক্ষিণে রাখিয়া আমরা বাগানে প্রবেশ করিলাম। শীতকালের দীর্ঘ গোধূলি তখন নামিয়া আসিতেছে। অবসন্ন দিবার শেষ রক্তিম আভা পশ্চিমে জঙ্গলের মাথায় অলক্ষ্যে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ চিন্তিত নতমুখে পকেটে হাত পুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছিল; চিন্তার ধারা তাহার কোন্ সর্পিল পথে চলিয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। হরিনাথ মাস্টারের ঘরে সে এমন কি পাইয়াছে যাহা হইতে তাহার মৃত্যু অনুমান করা যাইতে পারে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমিও একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। নিস্তব্ধ পাড়াগাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মাঝখানে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, অন্তর হইতে যেন গ্রহণ

করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তবু কিছুই বলা যায় না—গড়েনক হ্রদের উপরিভাগ বেশ প্রসন্নই দেখায়। ব্যোমকেশের সঙ্গে অনেক রহস্যময় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া একটু বুঝিয়াছিলাম যে, মুখ দেখিয়া মানুষ চেনা যেমন কঠিন, কেবলমাত্র বহিরবয়ব দেখিয়া কোনো ঘটনার গুরুত্ব নির্ণয় করাও তেমনি দুঃসাধ্য।

একটা ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, তারপর ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিল, 'জুতো পরে না যাবার একটা কারণ থাকতে পারে, জুতো পরে হাঁটলে শব্দ হয়। যে লোক দুপুর রাত্রে চুপি চুপি করে পালাচ্ছে তার পক্ষে খালি পায়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে জামা পরবে না কেন? চশমাটাও ফেলে যাবে কেন?'

আমি বলিলাম, 'চশমা সম্বন্ধে তুমি বলতে পার, কিন্তু জামা পরেনি একথা জানলে কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গুণে দেখলুম সবগুলো জামা রয়েছে। কাজেই প্রমাণ হল যে জামা পরে যায়নি।'

আমি বলিলাম, 'তার কতগুলো জামা ছিল তার হিসাব তুমি পেলে কোত্থেকে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেওয়ানজীর কাছ থেকে। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি, ভাণ্ডার থেকে মাস্টারকে দুটো গেঞ্জি আর দুটো জামা দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া সে নিজে একটা ছেঁড়া কামিজ পরে এসেছিল। সেগুলো সব আলনায় টাঙানো রয়েছে।'

আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, 'তাহলে তুমি অনুমান কর যে—'

ব্যোমকেশ পশ্চিম আকাশের ক্ষীণ শশিকলার দিকে তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওহে, দেখেছ? সবে মাত্র শুক্লপক্ষ পড়েছে। সে রাত্রে কি তিথি ছিল বলতে পারো?'

তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে কোনো দিনই সম্পর্ক নাই, নীরবে মাথা নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'বোধহয়—অমাবস্যা ছিল। না, চল পাঁজি দেখা যাক।' তাহার কণ্ঠস্বরে একটা নূতন উত্তেজনার আভাস পাইলাম।

চাঁদের দিকে চাহিয়া কবি এবং নবপ্রণয়ীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে জানিতাম; কিন্তু ব্যোমকেশের মধ্যে কবিত্ব বা প্রেমের বাষ্পটুকু পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও সে চাঁদ দেখিয়া এমন উতলা হইয়া উঠিল কেন বুঝিলাম না। যা হোক, তাহার ব্যবহার অধিকাংশ সময়েই বুঝিতে পারি না—ওটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাই সে যখন ফিরিয়া বাড়ির অভিমুখে চলিল তখন আমিও নিঃশব্দে তাহার সহগামী হইলাম।

আমরা বাগানের যে অংশটায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, সেখান হইতে বাড়ির ব্যবধান পঞ্চাশ গজের বেশী হইবে না। সিধা যাইলে মাঝে কয়েকটা বড় বড় ঝাউয়ের ঝোপ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। ঝাউয়ের ঝোপগুলা বাগানের কিয়দংশ ঘিরিয়া যেন পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

ঘাসের উপর দিয়া নিঃশব্দপদে আমরা প্রায় ঝাউ ঝোপের কাছে পৌঁছিয়াছি, এমন সময় ভিতর হইতে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ পাইয়া আমাদের গতি আপনা হইতেই রুদ্ধ হইয়া গেল। ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া আমাকে নীরব থাকিবার সঙ্কেত জানাইতেছে।

কান্নার ভিতর হইতে একটা ভাঙা গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—'বাবু, এই অনাদি সরকার আপনাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে—পুরনো চাকর বলে আমাকে দয়া করুন। মা-ঠাকরুণ ভুল বুঝেছেন। আমার মেয়ে অপরাধী—কিন্তু আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, ও মহাপাপ আমরা করিনি।'

কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নাই, তারপর হিমাংশুবাবুর কড়া কঠিন স্বর শুনা গেল—'ঠিক বলছ? তোমরা মারোনি?'

'ধর্ম জানেন হুজুর। আপনি মালিক—দেবতা, আপনার কাছে যদি মিথ্যে কথা বলি

তবে যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়।'

আবার কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নাই, তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'কিন্তু রাধাকে আর এখানে রাখা চলবে না। কালই তাকে অনাদ পাঠাবার ব্যবস্থা কর। একথা যদি জানাজানি হয় তখন আমি আর দয়া করতে পারব না—এমনিতেই বাড়িতে অশান্তির শেষ নেই।'

অনাদি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে হুজুর, কালই তাকে আমি কাশী পাঠিয়ে দেব; সেখানে তার এক মাসী থাকে—'

'বেশ—যদি খরচা চালাতে না পারো—'

ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। পা টিপিয়া টিপিয়া আমরা সরিয়া গেলাম।

মিনিট পনেরো পরে অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া কালীগতিবাবু একজন নিম্নতন কর্মচারীর সহিত কথা বলিতে-ছিলেন, বেবি তাঁহার হাত ধরিয়া আব্দারের সুরে কি একটা উপরোধ করিতেছিল—তাহার কথার খানিকটা শুনিতে পাইলাম, 'একবারটি ডাকো না—'

কালীগতি একটু বিরত হইয়া বলিলেন, 'আঃ পাগ্‌লি—এখন নয়।'

বেবি অনুনয় করিয়া বলিল, 'না দেওয়ানদাদু, একবারটি ডাকো, ঐ ওঁরা শুনবেন।' বলিয়া আমাদের নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

কালীগতি আমাদের দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, যে আমলাটি দাঁড়াইয়া ছিল তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া, প্রশান্ত হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাগানে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ।—বেবি কি বলছে? কাকে ডাকতে হবে?'

কালীগতি মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'ওর যত পাগলামি। এখন শেয়াল-ডাক ডাকতে হবে।'

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, 'সে কি রকম?'

কালীগতি বেবির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'এখন কাজের সময়, এখন বিরক্ত করতে নেই। যাও—মা'র কাছে গিয়ে একটু পড়তে বসো গে।'

বেবি কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে তাঁহার আঙুল মুঠি করিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'না দাদু, একবারটি—'

অগত্যা কালীগতি চুপি চুপি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, 'তুমি যখন ঘুমুতে যাবে তখন শোনাব—কেমন? এখন যাও লক্ষ্মী দিদি আমার।'

বেবি খুশী হইয়া বলিল, 'নিশ্চয় কিন্তু! তা না হ'লে আমি ঘুমুব না।'

'আচ্ছা বেশ।'

বেবি প্রস্থান করিলে কালীগতি বলিলেন, 'এইমাত্র থানা থেকে খবর নিয়ে লোক ফিরে এল—মাস্টারের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি।'

'ও!' ব্যোমকেশ একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি বলে কোনো কর্মচারী আছে কি?'

'আছে। অনাদি জমিদার বাড়ির সরকার।' বলিয়া কালীগতি উৎসুক নেত্রে তাহার পানে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ যেন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'তাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। সে কি আমলাদের পাড়াতেই থাকে?'

কালীগতি বলিলেন, 'না। সে বহুকালের পুরনো চাকর। বাড়ির পিছন দিকে আস্তা-বলের লাগাও কতকগুলো ঘর আছে, সেই ঘরগুলো নিয়ে সে থাকে।'

'একলা থাকে?'

'না, তার এক বিধবা মেয়ে আর স্ত্রী আছে। মেয়েটি ক'দিন থেকে অসুখে ভুগ্‌ছে; অনাদিকে বললুম কবিরাজ ডাকো, তা সে রাজী নয়। বললে, আপনি সেরে যাবে।—কেন

বলুন দেখি?'

'না—কিছু নয়। কাছে পিঠে কারা থাকে তাই জানতে চাই। অন্যান্য আমলারা বুঝি হাতার বাইরে থাকে?'

'হ্যাঁ, তাদের জন্যে একটু দূরে বাসা তৈরী করিয়ে দেওয়া হয়েছে—সবসুদ্ধ সাত-আট ঘর আমলা আছে। শহর থেকে যাতায়াত করলে সুবিধা হয় না, তাই কর্তার আমলেই তাদের জন্যে একটা পাড়া বসানো হয়েছিল।'

'শহর এখান থেকে কতদূর?'

'মাইল পাঁচেক হবে। সামনের রাস্তাটা সিধা পূবে দিকে শহরে গিয়েছে।'

এই সময় হিমাংশুবাবু বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, 'আসুন ব্যোমকেশবাবু, আমার অস্ত্রাগার আপনাদের দেখাই।'

আমরা সাগ্রহে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, দেওয়ান আহ্নিক করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া খড়ম পায়ে অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন।

হিমাংশুবাবু একটি মাঝারি আয়তনের ঘরে আমাদের লইয়া গেলেন। ঘরের মধ্যস্থলে টেবিলের উপর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। দেখিলাম, মেঝেয় বাঘ ভাল্লুক ও হরিণের চামড়া বিছানো রহিয়াছে; দেওয়ালের ধারে ধারে কয়েকটি আলমারি সাজানো। হিমাংশুবাবু একে একে আলমারিগুলি খুলিয়া দেখাইলেন, নানাবিধ বন্দুক পিস্তল ও রাইফেলে আলমারি-গুলি ঠাসা। এই হিংস্র অস্ত্রগুলির প্রতি লোকটির অদ্ভুত স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। প্রত্যেকটির গুণাগুণ—কোনটির দ্বারা কবে কোন্ জন্তু বধ করিয়াছেন, কাহার পাল্লা কতখানি, কোন্ রাইফেলের গুলি বামদিকে ঈষৎ প্রক্ষিপ্ত হয়—এ সমস্ত তাঁহার নখদর্পণে। এই অস্ত্রগুলি তিনি প্রাণান্তেও কাহাকেও ছুঁইতে দেন না; পরিষ্কার করা, তেল মাখানো সবই নিজে করেন।

অস্ত্র দেখা শেষ হইলে আমরা সেই ঘরেই বসিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিলাম। নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইল। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একই মানুষকে এত বিভিন্ন রূপে দেখা যায় যে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা অভ্রান্ত ধারণা করিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু কদাচিৎ স্বভাবছদ্মবেশী মানুষের মন অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আত্মপরিচয় দিয়া ফেলে। এই ঘরে বসিয়া আয়াসহীন অনাড়ম্বর আলোচনার ভিতর দিয়া হিমাংশুবাবুর চিত্তটিও যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধরা দিল। লোকটি যে অতিশয় সরল চিত্ত—মনটিও তাঁহার বন্দুকের গুলির মত একান্ত সিধা পথে চলে, এ বিষয়ে অন্তত আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না।

আমাদের সঞ্চরমান আলোচনা নানা পথ ঘুরিয়া কখন অজ্ঞাতসারে বিষয় সম্পত্তি পরিচালনা, দেশের জমিদারের অবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। হিমাংশু-বাবু এই সূত্রে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। প্রজাদের সঙ্গে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া নিয়ত সঙ্ঘর্ষে তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারীর আয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অথচ মামলা মোকদ্দমায় খরচের অন্ত নাই; ফলে, এই কয় বছরে ঋণের মাত্রা প্রায় লক্ষের কোঠায় ঠেকিয়াছে। নিজের বিষয় সম্পত্তির সম্বন্ধে এই সব গুহ্য কথা তিনি অকপটে প্রকাশ করিলেন। দেখিলাম, জমিদারী সংক্রান্ত অশান্তি তাঁহাকে বিষয় সম্পত্তির প্রতি আরো বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বিপদের গুরুত্ব অনভিজ্ঞতাবশতঃ ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না, তাই মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট আতঙ্কে মন শঙ্কিত হইয়া উঠে; তখন সেই শঙ্কাকে তাড়াইবার জন্য প্রিয় ব্যসন শিকারের প্রতি আরো আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়েন। তাঁহার মনের অবস্থা বর্তমানে এইরূপ।

কথায়বার্তায় রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। অতঃপর অন্দর হইতে আহারের ডাক আসিল। এই সময় অনাদি সরকারকে দেখিলাম; সে আমাদের ডাকিতে আসিয়াছিল। লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশ হইবে; অত্যন্ত শীর্ণ কোলকুঁজা চেহারা। গালের মাংস চুপসিয়া অভ্যন্তরের কোন অতল গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ঝাঁকড়া গোঁফ ওষ্ঠাধর

লঙ্ঘন করিয়া চিবুকের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। চোখে একটা অস্বচ্ছন্দ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি—যেন কোনো দারুণ দুষ্কৃতি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক হইয়া আছে।

ব্যোমকেশ তাহাকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। তারপর আমরা তিনজনে তাহাকে অনুসরণ করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলাম।

আহারাদির পর একজন ভৃত্য আমাদের পথ দেখাইয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেল। ভৃত্যটির নাম ভুবন—সেই হিমাংশুবাবুর খাস বেয়ারা। শয়নকক্ষে ইজিচেয়ারে বসিয়া আমরা সিগারেট ধরাইলাম; ভুবন মশারি ফেলিয়া, জলের কুঁজা হাতের কাছে রাখিয়া, ঘরের এটা ওটা ঝাড়িয়া ঝাড়ন স্কন্ধে প্রস্থান করিতেছিল, ব্যোমকেশ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি তো হরিনাথ মাস্টারকে ছ'মাস ধরে দেখেছ, সে কি সব সময় চশমা পরে থাকত?'

আমরা যে চুরির তদন্ত করিতে আসিয়াছি তাহা ভুবন বোধকরি জানিত, তাই কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া সে উৎসুকভাবে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, চব্বিশ ঘন্টাই তো চশমা পরে থাকতেন। একদিন চশমা না পরে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। বিনা চশমায় তিনি এক-পা চলতে পারতেন না বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। আচ্ছা, তার জুতো ক'জোড়া ছিল বলতে পার?

ভুবন হাসিয়া বলিল, 'জুতো আবার ক'জোড়া থাকবে বাবু, এক জোড়া। তাও সরকার থেকে কিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে-জোড়া পরে তিনি এসেছিলেন সে তো এমন ছেঁড়া যে কুকুরেও খায় না। আমরা সেই দিনই সে জুতো টান মেরে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছিলুম।'

'বটে! আচ্ছা, মাস্টারের ঘরের দেয়ালে যে একটি মা-কালীর ছবি টাঙানো রয়েছে সেটা কি মাস্টার সঙ্গে করে এনেছিল?'

'আজ্ঞে না হুজুর, মাস্টারবাবু একটি খড়কে কাঠিও সঙ্গে করে আননিনি। ও ছবি দেওয়ানজীর কাছ থেকে মাস্টারবাবু একদিন এনে নিজের ঘরে টাঙিয়েছিলেন।'

'বুঝেছি।' ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

ভুবন জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কিছু চাই না হুজুর?'

'না। ভাল কথা, একটা কাজ করতে পার? বাড়িতে পাঁজি আছে নিশ্চয়, একবার আনতে পার?'

ভুবন বোধকরি মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু সে জমিদার বাড়ির লেফাফা-দুরস্ত চাকর, সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল, 'এখনি কি চাই হুজুর?'

'এখনি হলে ভাল হয়।'

'যে আজ্ঞে—এনে দিচ্ছি।'

ভুবন বাহির হইয়া গেল। আমরা নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল।

তারপর, হঠাৎ অতি সন্নিকটে একটানা বিকট একটা আর্তনাদ শুনিয়া আমরা ধড়মড় করিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু তখনি বুঝিলাম, অনৈসর্গিক কিছু নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। পাঁচ-ছয়টা শৃগাল একত্র হইয়া নিকটেরই কোনো স্থান হইতে সম্মিলিত ঊর্ধ্বস্বরে যাম ঘোষণা করিতেছে। এত নিকট হইতে শব্দটা আসিল বলিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছিলাম।

এই সময় ভুবন পাঁজি হাতে ফিরিয়া আসিল। আমি বলিয়া উঠিলাম, 'ও কি হে! বাড়ির এত কাছে শেয়াল ডাকছে?'

শেয়ালের ডাক তখন থামিয়াছে, ভুবন হাসি চাপিয়া বলিল, 'আসল শেয়াল নয় হুজুর। বৌদিদি আজ সন্ধ্যে থেকে বায়না ধরেছিলেন দেওয়ান ঠাকুরের কাছে শেয়াল ডাক শুনবেন। তাই তিনিই ডাকছেন।'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যেবেলা বৌ বলছিল বটে। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা তো দেওয়ানজীর! একেবারে অবিকল শেয়ালের ডাক, কিছু বোঝবার জো নেই!'

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। দেওয়ান ঠাকুর চমৎকার জন্তু-জানোয়ারের ডাক

ডাকতে পারেন।' বলিয়া পাঁজি ব্যোমকেশের পাশে টেবিলের উপর রাখিল।

ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যেন হঠাৎ পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে; চোখের দৃষ্টি স্থির, সর্বাঙ্গের পেশী টান হইয়া শক্ত হইয়া আছে। আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, 'কি হে?'

ব্যোমকেশের চমক ভাঙিল। চোখের সম্মুখ দিয়া হাতটা একবার চালাইয়া বলিল, 'কিছু না।—এই যে পাঁজি এনেছ? বেশ, তুমি এখন যেতে পারো।'

ভুবন প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ পাঁজিটা তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। খানিক পরে একটা পাতায় আসিয়া তাহার দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। সেই পাতাটা পড়িয়া সে পাঁজি আমার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, 'এই দ্যাখ।'

মনে হইল, তাহার গলার স্বর উত্তেজনায় ঈষৎ কাঁপিয়া গেল।

পাঁজির নির্দিষ্ট পাতাটা পড়িলাম। দেখিলাম, যে-রাত্রে মাস্টার নিরুদ্দেশ হইয়া যায় সে-রাত্রিটা ছিল অমাবস্যা।

পরদিন সকাল সাতটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—তখনো সমস্ত বাড়িটা সুপ্ত। একজন ভৃত্য বারান্দা ঝাঁট দিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে শীতকালে বেলা আটটা সাড়ে আটটার পূর্বে কেহ শয্যা ত্যাগ করে না। ইহাই এ বাড়ির রেওয়াজ।

এই দেড় ঘণ্টা সময় কি করিয়া কাটানো যায়? আকাশে একটু কুয়াশার আভাস ছিল; সূর্যের আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই। আমার মন উসখুস করিয়া উঠিল, বলিলাম, 'চল ব্যোমকেশ, এখন তো তোমার কোনো কাজ হবে না; জঙ্গলে গিয়ে দু'চারটে পাখী মারা যাক। তারপর এদের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে ফিরে আসা যাবে।'

প্রথম বন্দুক চালাইতে শিখিয়া আগ্রহের মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল, মনে হইতেছিল যাহা পাই তাহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া দিই। বিশেষতঃ কাল বন্দুক দুটা কুমার বাহাদুর এখানেই রাখিয়া গিয়াছিলেন, টোটাও কোটের পকেটে কয়েকটা অবশিষ্ট ছিল।

ব্যোমকেশ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'চল।'

বন্দুক কাঁধে করিয়া বাহির হইলাম। যে চাকরটা ঝাঁট দিতেছিল তাহাকে প্রশ্ন করায় সে জঙ্গলে যাইবার রাস্তা দেখাইয়া দিল; বলিল, এই পথে সিধা যাইলে বালির পাশ দিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিতে পারিব। আমরা সবুজ ঘাসে ভরা চারণভূমির উপর দিয়া চলিলাম।

কুয়াশার জন্য ঘাসে শিশির পড়ে নাই, জুতা ভিজিল না। চলিতে চলিতে দেখিলাম, সম্মুখে এক মাইল দূরে বনের গাছগুলি গাঢ় বর্ণে আঁকা রহিয়াছে, তাহার কোলের কাছে বালু-বেলা অর্ধচন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে—দূর হইতে অস্পষ্ট আলোকে দেখিয়া মনে হয় যেন একটা লম্বা খাল জঙ্গলের পাদমূল বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছে। আমরা যেদিকে চলিয়াছিলাম সেইদিকে উহার দক্ষিণ প্রান্তটা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া একটা অনুচ্চ পাড়ের কাছে আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে; অতঃপর দক্ষিণ দিকে আর বালি নাই।

মিনিট পনেরো হাঁটিবার পর পূর্বোক্ত পাড়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম; দেখিলাম পাড় একটা নয়—দুইটা। কোনো কালে হয়তো বালুর দক্ষিণ দিকে জলরোধ করিবার জন্য একটা উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল—বর্তমানে সেটা দ্বিধা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মাঝখানে আন্দাজ পনেরো হাত চওড়া একটা প্রণালী একদিকের সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের সহিত অপর দিকের বালুর চড়ার সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

আমরা নিকটতর ঢিবিটার উপর উঠিলাম। সম্মুখে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মত একটা ক্ষীণ রেখা ঘাসের সীমানা নির্দেশ করিয়া দিতেছে—তাহার পরেই অনিশ্চিত ভয়সঙ্কুল বালুর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঠিক কোনখানটায়

সেই ভয়ানক চোরাবালি কে বলিতে পারে?

বাঁধের উপর উঠিয়া যে বস্তুটি প্রথমে চোখে পড়িয়াছিল তাহার কথা এখনো বলি নাই। সেটি একটি অতি জীর্ণ ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘর। বাঁধের ভাঙনের দক্ষিণ মুখটি আগুলিয়া এই কুটীর পড়ি পড়ি হইয়া কোনো মতে দাঁড়াইয়া আছে—উচ্চতা এত কম যে পাড়ের আড়াল হইতে তাহার মট্‌কা দেখা যায় না। ছিটা বেড়ার দেওয়াল, মাটি লেপিয়া জলবৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা হইয়াছিল; এখন প্রায় সর্বত্র মাটি খসিয়া গিয়া জীর্ণ উই-ধরা হাড়-পাঁজর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উপরের দুচালা খড়ের চালটিও প্রায় উলঙ্গ—খড় পচিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, কোথায়ও বা গলিত অবস্থায় ঝুলিতেছে। বোধকরি চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ইহাতে কেহ বাস করে নাই।

বনের ধারে লোকালয় হইতে বহু দূরে এইরূপ নিঃসঙ্গ একটি কুটীর দেখিয়া আমাদের ভারি বিস্ময় বোধ হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই তো! চল, ঘরটা দেখা যাক।'

আমরা ফিরিয়া বাঁধ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় আকাশে শাঁই শাঁই শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া দেখি একঝাঁক বন-পায়রা মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে বন্দুকে টোটা ভরিয়া ফায়ার করিল। আমার একটু দেরী হইয়া গেল, যখন বন্দুক তুলিলাম তখন পায়রার ঝাঁক পাল্লার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশের আওয়াজে একটা পায়রা নিম্নে বালুর উপর পড়িয়াছিল। সেটাকে উদ্ধার করিবার জন্য সম্মুখ দিয়া নামিতে গিয়া দেখিলাম সে-পথে নামা নিরাপদ নয়—পথ এত বেশী ঢালু যে পা হড়্‌কাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'এত তাড়াতাড়ি কিসের হে! মরা পাখী তো আর উড়ে পালাবে না। চল, ঐ দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক—কুঁড়ে ঘরটাও দেখা হবে।

তখন যে পথে উঠিয়াছিলাম সেই পথে নামিয়া বাঁধের ভাঙনের মুখে উপস্থিত হইলাম। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি দ্বার আছে, যেটা দিয়া প্রবেশ করিলাম তাহার কবাট নাই, কিন্তু যেটা বালুর দিকে সেটাতে এখনো একটা বাখারির আগড় লাগিয়া আছে।

ঘরের মধ্যে মনুষ্যের ব্যবহারের উপযোগী কিছুই নাই। মেঝে বোধহয় পূর্বে গোময়-লিপ্ত ছিল, এখন তাহার উপর ঘাস গজাইয়াছে—পচা খড় চাল হইতে পড়িয়া স্থানটাকে আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ঘরটি চওড়ায় ছয় হাতের বেশী হইবে না কিন্তু দৈর্ঘ্যে দুই বাঁধের মধ্যবর্তী স্থানটা সমস্ত জুড়িয়া আছে। এদিক হইতে বালুর দিকে যাইতে হইলে ঘরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়; অন্য পথ নাই।

ব্যোমকেশ ঘরের অপরিষ্কার মেঝে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'সম্প্রতি এ ঘরে কোনো মানুষ এসেছে। এখানে খড়গুলো চেপে গেছে—দেখেছ? ঐ কোণে কিছু একটা টেনে সরিয়েছে। এ ঘরে মানুষের যাতায়াত আছে।'

মানুষের যাতায়াত থাকা কিছু বিচিত্র নয়। রাখাল বালকেরা এদিকে গরু চরাইতে আসে, হয়তো এই ঘরের মধ্যে খেলা করিয়া তাহারা দ্বিপ্রহর যাপন করে। 'তা হবে' বলিয়া আমি অন্য দ্বারের আগল খুলিয়া বালির দিকে বাহির হইলাম। মনটা পাখীর দিকেই পড়িয়া ছিল।

কিন্তু পাখী কোথায়? পাখীটা সম্মুখেই পড়িয়াছিল, লক্ষ্য করিয়াছিলাম; অথচ কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। আমি আশ্চর্য হইয়া ব্যোমকেশকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওহে, তোমার পাখী কৈ? সত্যিই কি মরা পাখী উড়ে গেল নাকি?'

ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। সেও চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু পাখীর একটা পালকও কোথাও দেখা গেল না। ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'তাই তো।

একটু এগিয়ে দেখা যাক, হয়তো আশেপাশে কোথাও আছে।' বলিয়া আমি বালুর উপর পদার্পণ করিতে যাইব, ব্যোমকেশের একটা হাত বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া আমার কোটের কলার চাপিয়া ধরিল।

'থামো—'

'কি হল?' আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইলাম।

'বালির ওপর পা বাড়িও না।'

সদ্য-ছোঁড়া কার্তুজের শূন্য খোলটা ব্যোমকেশ পকেটেই রাখিয়াছিল, এখন সেটা বাহির করিল। সম্মুখদিকে প্রায় বিশ হাত দূরে বালুর উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'ভাল করে লক্ষ্য কর।' চাপা উত্তেজনায় তাহার স্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

লাল রঙের খোলটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল, সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। কি সর্বনাশ!

কার্তুজ খোলের ভারী দিকটা নামিয়া গিয়া সেটা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তারপর নিঃশব্দে বালুর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই চোরাবালি! এবং ইহাতেই আমি গবেটের মত এখনি পদার্পণ করিতে যাইতেছিলাম। ব্যোমকেশ বাধা না দিলে আজ আমার কি হইত ভাবিয়া শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

ব্যোমকেশের চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার ওষ্ঠাধর বিভক্ত হইয়া দাঁতগুলা ক্ষণকালের জন্য দেখা গেল। সে বলিল, 'দেখলে! উঃ, কি ভয়ংকর! কি ভয়ানক!'

আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

আমার কথা যেন শুনিতেই পায় নাই এমনি ভাবে সে কেবল অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, 'কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!' দেখিলাম, তাহার মুখের রং ফ্যাকাসে হইয়া গেলেও চোখের দৃষ্টি ও চোয়ালের হাড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

অতঃপর ব্যোমকেশ কুটীরের চাল হইতে কয়েক টুকরা বাখারি ভাঙিয়া আনিল, একটি একটি করিয়া সেগুলি বালুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেখা গেল, ঘাসের সীমানার প্রায় দশ হাত দূর হইতে চোরাবালি আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে তাহা জানা গেল না, কারণ যতদূর পর্যন্ত বাখারি ফেলা হইল সব বাখারিই ডুবিয়া গেল। পুরাতন বাঁধের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাহুবেষ্টন এই চোরাবালিকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতীত যুগের কোনো সদাশয় জমিদার হয়তো প্রজাদের জীবন রক্ষার্থেই এই বাঁধ করাইয়াছিলেন, তারপর কালক্রমে বাঁধও ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

চোরাবালির পরিধি নির্ণয় যথাসম্ভব শেষ করিয়া আমরা আবার কুটীরের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, আমরা চোরাবালির সন্ধান পেয়েছি, একথা যেন ঘুণাক্ষরে কেউ না জানতে পারে। বুঝলে?'

আমি ঘাড় নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তখন কুটীরের সম্মুখে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'বাঃ! ঘরটি কি চমৎকার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ? পিছনে পনের হাত দূরে চোরাবালি, সামনে বিশ হাত দূরে গভীর বন—দুধারে বাঁধ। কে এটি তৈরী করেছিল জানতে ইচ্ছে করে।'

কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল। আমি বনের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, গাছের ছায়ার নীচে দিয়া একজন হাফ্-প্যাণ্ট পরিহিত লোক, কাঁধে বন্দুক লইয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের দিকে আসিতেছে। গাছের ছায়ার বাহিরে আসিলে দেখিলাম, হিমাংশুবাবু।

হিমাংশুবাবু দূর হইতে হাঁকিয়া বলিলেন, 'আপনারা কোথায় ছিলেন? আমি জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'অজিত, মনে থাকে যেন—চোরাবালি সম্বন্ধে কোনো কথা নয়।' তারপর গলা চড়াইয়া বলিল,—'অজিতের পাল্লায় পড়ে পাখী শিকারে বেরিয়ে পড়েছিলুম। পাখীরা অবশ্য বেশ অক্ষত শরীরে আছে, কিন্তু আর্মস আক্টের বিরুদ্ধে অজিত যেরকম অভিযান আরম্ভ করেছে, শীগ্গির পুলিসের হাতে পড়বে।'

আমি বলিলাম, 'এবার কলকাতায় গিয়েই একটা বন্দুকের লাইসেন্স কিনব।'

হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বন্দুক নামাইয়া বলিলেন, 'তারপর,

কিছু পেলেন?'

'কিছু না। আপনি একেবারে রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছেন যে!' বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহার অস্ত্রটির দিকে তাকাইল।

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—সকালে উঠেই শুনলুম জঙ্গলে নাকি বাঘের ডাক শোনা গেছে। তাই তাড়াতাড়ি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম; চাকরটা বললে আপনারা এ'দিকে এসেছেন—একটু ভাবনা হল। কারণ, হঠাৎ যদি বাঘের মুখে পড়েন তাহলে আপনাদের পাখীমারা বন্দুক আর দশ নম্বরের ছর্‌রা কোনো কাজেই লাগবে না।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাঘ এসেছে কার মুখে শুনলেন?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'ঠিক যে এসেছেই একথা জোর করে কেউ বলতে পারছে না। আমার গয়লাটা বলছিল যে গরুগুলো সমস্ত রাত খোঁয়াড়ে ছটফট করেছে, তাই তার আন্দাজ যে হয়তো তারা বাঘের গন্ধ পেয়েছে। তা ছাড়া, দেওয়ানজী বলছিলেন তিনি নাকি অনেক রাত্রে বাঘের ডাকের মতন একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। যা হোক, চলুন এবার ফেরা যাক। এখনো চা খাওয়া হয়নি।'

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সাড়ে আটটা। চলুন। আচ্ছা, এই পোড়ো ঘরটা কার? এরকম নির্জন স্থানে কে এই ঘর তৈরী করেছিল? কেনই বা করেছিল? কিছু জানেন কি?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'জানি বৈকি। চলুন, যেতে যেতে বলছি।'

তিনজনে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। হিমাংশুবাবু চলিতে চলিতে বলিলেন, 'বছর চার-পাঁচ আগে—ঠিক ক'বছর হল বলতে পারছি না, তবে বাবা মারা যাবার পর—হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে এক বিরাট তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। ভয়ঙ্কর চেহারা, মাথায় জটার মত চুল, অজস্র গোঁফদাড়ি, পাঁচ হাত লম্বা এক জোয়ান। পরনে স্রেফ একটি নেংটি, চোখ দুটো লাল টক্‌টক্‌ করছে—আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত রুঢ়ভাবে 'তুইতোকারি' করে বললেন যে তিনি কিছুদিন আমার আশ্রয়ে অতিথি থেকে সাধনা করতে চান।

'সাধু-সন্ন্যাসীর উপর আমার বিশেষ ভক্তি নেই—ও সব বুজরুকি আমার সহ্য হয় না; বিশেষতঃ ভেকধারীদের ঔদ্ধত্য আর স্পর্ধা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে দূর করে দিচ্ছিলুম; কিন্তু দেওয়ানজী মাঝ থেকে বাধা দিলেন। তাঁর বোধহয় তান্ত্রিক ঠাকুরকে দেখেই খুব ভক্তি হয়েছিল। তিনি আমাকে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, প্রত্যবায় অভিসম্পাত প্রভৃতির ভয়ও দেখালেন। কিন্তু আমি ঐ উলঙ্গ লোকটাকে বাড়িতে থাকতে দিতে কিছুতেই রাজী হলুম না। তখন দেওয়ানজী তান্ত্রিক ঠাকুরের সঙ্গে মোকাবিলা করে ঠিক করলেন যে তিনি আমার জমিদারীর মধ্যে কোথাও কুঁড়ে বেঁধে থাকবেন—আর ভাণ্ডার থেকে তাঁর নিয়মিত সিধে দেওয়া হবে। দেওয়ানজীর আগ্রহ দেখে আমি অগত্যা রাজী হলুম।

'বাবাজী তখন এই জায়গাটি পছন্দ করে কুঁড়ে বাঁধলেন। মাস ছয়েক এখানে ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তবে দেওয়ানজী প্রায়ই যাতায়াত করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ভক্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে শুনতে পাই তিনি বাবাজীর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিলেন। অবশ্য উনি আগেও শাক্তই ছিলেন কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না।

'যা হোক, বাবাজী একদিন হঠাৎ সরে পড়লেন। সেই থেকে ও ঘরটা খালি পড়ে আছে।'

গল্প শুনিতে শুনিতে বাড়ি আসিয়া পেঁৗছিলাম। চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল। বারান্দায় টেবিল পাতিয়া তাহার উপরে চা, কচুরি, পাখীর মাংসের কাটলেট, ডিমের অমলেট ইত্যাদি বহুবিধ লোভনীয় আহার্য ভৃত্য খানসামা সাজাইয়া রাখিতেছিল। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে চেয়ার টানিয়া লইয়া উক্ত আহার্য বস্তুর সৎকারে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৎকার কার্য অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। কুমার ত্রিদিব অবতরণ করিলেন।

মোটরের পশ্চাতে আমাদের সুটকেস কয়টা বাঁধা ছিল, সেগুলো নামাইবার হুকুম দিয়া কুমার আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন; ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কদ্দূর?'

ব্যোমকেশ অনিশ্চিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বেশী দূর নয়। তবে দু'এক দিনের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে আশা করি। আজ একবার শহরে যাওয়া দরকার। পুলিসের কাছ থেকে কিছু খোঁজ খবর নিতে হবে।'

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'বেশ তো, চলুন আমার গাড়িতে ঘুরে আসা যাক। এখন বেরুলে বেলা বারোটার মধ্যে ফেরা যাবে।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'আমার একটু সময় লাগবে; সন্ধ্যের আগে ফেরা হবে না। একেবারে খাওয়া দাওয়া করে বেরুলে বোধহয় ভাল হয়।'

কুমার বলিলেন, 'সে কথাও মন্দ নয়। হিমাংশু, তুমি চল না হে, খুব খানিক হৈ হৈ করে আসা যাক। অনেকদিন শহরে যাওয়া হয়নি।'

হিমাংশুবাবু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'না ভাই, আমার আজ আর যাওয়ার সুবিধা হবে না। একটু কাজ—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আপনার গিয়ে কাজ নেই। অজিতও থাকুক। আমরা দু'জনে গেলেই যথেষ্ট হবে।' বলিয়া কুমারের দিকে তাকাইল। তাহার চাহনিতে বোধহয় কোনো ইশারা ছিল, কারণ কুমার বাহাদুর পুনরায় কি একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন।

বেলা এগারোটার সময় ব্যোমকেশ কুমারের গাড়িতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার আগে আমাকে বলিয়া গেল, 'চোখ দুটো বেশ ভাল করে খুলে রেখো। আমার অবর্তমানে যদি কিছু ঘটে লক্ষ্য করো।'

তাহাদের গাড়ি ফটক পার হইয়া যাইবার পর হিমাংশুবাবুর মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন পরিত্রাণের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা তাঁহার বাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হওয়াতে তিনি যে সুখী হইতে পারেন নাই, এই সন্দেহ আবার আমাকে পীড়া দিতে লাগিল।

দেওয়ান কালীগতিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি; আমাদের মুখের ভাব হইতে মনের কথা আন্দাজ করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া বারান্দায় চেয়ারে উপবেশন করিয়া নানা বিষয়ে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। হিমাংশুবাবুও কথাবার্তায় যোগ দিলেন। ব্যোমকেশ সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হইল। ব্যোমকেশের কীর্তিকলাপ প্রচার করিতে আমি কোনদিনই পশ্চাৎপদ নই। সে যে কতবড় ডিটেক্‌টিভ তাহা বহু উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলাম। তাহার সাহায্য পাওয়া যে কতখানি ভাগ্যের কথা সে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িলাম না। শেষে বলিলাম, 'হরিনাথ মাস্টার যে বেঁচে নেই একথা আর কেউ এত শীগ্‌গির বার করতে পারত না।'

দু'জনেই চমকিয়া উঠিলেন—'বেঁচে নেই!'

কথাটা বলিয়া ফেলা উচিত হইল কিনা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যোমকেশ অবশ্য বারণ করে নাই, তবু মনে হইল, না বলিলেই বোধহয় ভাল হইত। আমি নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া রহস্যপূর্ণ শিরঃসঞ্চালন করিলাম, বলিলাম, 'যথাসময় সব কথা জানতে পারবেন।'

অতঃপর বারোটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম। কালীগতি ও হিমাংশুবাবু আমার অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া আর কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু হরিনাথের মৃত্যুসংবাদ যে তাঁহাদের দু'জনকেই বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না।

দুপুরবেলাটা বোধ করি নিঃসঙ্গভাবে ঘরে বসিয়াই কাটাইতে হইত; কারণ হিমাংশু-বাবু আহারের পর একটা জরুরী কাজের উল্লেখ করিয়া অন্দরমহলে প্রস্থান করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু বেবি আসিয়া আমাকে সঙ্গদান করিল। সে আসিয়া প্রথমেই ব্যোমকেশের খোঁজ খবর লইল এবং সকালবেলা মেনির সন্তান প্রসবের জন্য আসিতে পারে নাই বলিয়া যথোচিত দুঃখ জ্ঞাপন করিল। তারপর আমাকে নানাপ্রকার বিচিত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ও নিজেদের পারিবারিক বহু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া গল্প জমাইয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময় বেবি বলিল, 'মা আজ তিনদিন ভাত খাননি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাঁর অসুখ করেছে বুঝি?'

মাথা নাড়িয়া গম্ভীরমুখে বেবি বলিল, 'না, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

এবিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা ভদ্রোচিত হইবে কিনা ভাবিতেছি এমন সময় খোলা জানালা দিয়া দেখিলাম, একটা সবুজ রঙের সিডান বডির মোটর গ্যারাজের দিক হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়িখানি সাবধানে ফটক পার হইয়া শহরের দিকে মোড় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিলাম, চালক স্বয়ং হিমাংশুবাবু। গাড়ির অভ্যন্তরে কেহ আছে কিনা দেখা গেল না।

বেবি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'আমাদের নতুন গাড়ি।'

ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। হিমাংশুবাবু ঠিক যেন চোরের মত মোটর লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন? সঙ্গে কেহ ছিল কি? তিনি গোড়া হইতেই আমাদের কাছে একটা কিছু লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আগমন তাঁহার কোনো কাজে বাধা দিয়াছে; তাই তিনি ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন অথচ বাহিরে কিছু করিতে পারিতেছেন না—এই ধারণা ক্রমেই আমার মনে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তবে কি তিনি হরিনাথের অন্তর্ধানের গূঢ় রহস্য কিছু জানেন? তিনি কি জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছেন? ভীত-দৃষ্টি রুগ্নকায় অনাদি সরকারের কথা মনে পড়িল। সে কাল প্রভুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছিল কি জন্য? 'ও মহাপাপ করিনি'—কোন্ মহাপাপ হইতে নিজেকে ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিতেছিল!

বেবি আজ আবার একটা নূতন খবর দিল—হিমাংশুবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে। ঝগড়া এতদূর গড়াইয়াছে যে স্ত্রী তিনদিন আহার করেন নাই। কি লইয়া ঝগড়া? হরিনাথ মাস্টার কি এই কলহ-রহস্যের অন্তরালে লুকাইয়া আছে!

'তুমি ছবি আঁকতে জানো?' বেবির প্রশ্নে চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল।

অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, 'জানি।'

ঝামর চুল উড়াইয়া বেবি ছুটিয়া চলিয়া গেল। কোথায় গেল ভাবিতেছি এমন সময় সে একটা খাতা ও পেন্সিল লইয়া ফিরিয়া আসিল। খাতা ও পেন্সিল আমার হাতে দিয়া বলিল, 'একটা ছবি এঁকে দাও না। খু—ব ভাল ছবি।'

খাতাটি বেবির অঙ্কের খাতা। তাহার প্রথম পাতায় পাকা হাতে লেখা রহিয়াছে, শ্রীমতী বেবিরাণী দেবী।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'একি তোমার মাস্টারমশায়ের হাতের লেখা?'

বেবি বলিল, 'হ্যাঁ।'

খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বেশীর ভাগই উচ্চ গণিতের অঙ্ক; বেবির হাতে লেখা যোগ, বিয়োগ খুব অল্পই আছে। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম 'এসব অঙ্ক কে করেছে?'

বেবি বলিল, 'মাস্টারমশাই। তিনি খালি আমার খাতায় অঙ্ক করতেন।'

দেখিলাম, মিথ্যা নয়। খাতার অধিকাংশ পাতাই মাস্টারের কঠিন দীর্ঘ অঙ্কের অক্ষরে পূর্ণ হইয়া আছে। কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটি ছোট মেয়েকে গণিতের গোড়ার কথা শিখাইতে গিয়া কলেজের শিক্ষিতব্য উচ্চ গণিতের অবতারণার সার্থকতা কি?

খাতার পাতাগুলা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে একস্থানে দৃষ্টি পড়িল—

একটা পাতার আধখানা কাগজ কে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে মনে হইল যেন পেন্সিল দিয়া খাতার উপর কিছু লিখিয়া পরে কাগজটা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ, খাতার পরের পৃষ্ঠায় পেন্সিলের চাপা-দাগ অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। আলোর সম্মুখে ধরিয়া নখচিহ্নের মত দাগগুলি পড়িবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পড়িতে পারিলাম না।

বেবি অধীর ভাবে বলিল, 'ও কি করছ। ছবি এঁকে দাও না!'

ছেলেবেলায় যখন ইস্কুলে পড়িতাম তখন এই ধরনের বর্ণহীন চিহ্ন কাগজের উপর ফুটাইয়া তুলিবার কৌশল শিখিয়াছিলাম, এখন তাহা মনে পড়িয়া গেল।

বেবিকে বলিলাম, 'একটা ম্যাজিক দেখবে?'

বেবি খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ—দেখব।'

তখন খাতা হইতে এক টুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাহার উপর পেন্সিলের শিষ ঘষিতে লাগিলাম; কাগজটা যখন কালো হইয়া গেল তখন তাহা সন্তর্পণে সেই অদৃশ্য লেখার উপর বুলাইতে লাগিলাম। ফটোগ্রাফের নেগেটিভ্ যেমন রাসায়নিক জলে ধৌত করিতে করিতে তাহার ভিতর হইতে ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে, আমার মৃদু ঘর্ষণের ফলেও তেমনি কাগজের উপর ধীরে ধীরে অক্ষর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সবগুলি অক্ষর ফুটিল না, কেবল পেন্সিলের চাপে যে অক্ষরগুলি কাগজের উপর গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছিল সেইগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ওঁ হ্রীং...ক্লীং...

রাত্রি ১১...৫...অম...পড়িবে।

অসম্পূর্ণ দুর্বোধ অক্ষরগুলার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ওঁ হ্রীং ক্লীং—বোধহয় কোনো মন্ত্র হইবে। কিন্তু সে যাহাই হোক, হস্তাক্ষর যে হরিনাথ মাস্টারের তাহাতে সন্দেহ রহিল না। প্রথম পৃষ্ঠার লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম, অক্ষরের ছাঁদ একই প্রকারের।

বেবি ম্যাজিক দেখিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় নাই; সে ছবি আঁকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন তাহার খাতায় কুকুর বাঘ রাক্ষস প্রভৃতি বিবিধ জন্তুর চিত্তাকর্ষক ছবি আঁকিয়া তাহাকে খুশী করিলাম। মন্ত্র-লেখা কাগজটা আমি ছিঁড়িয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলাম।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় হিমাংশুবাবু ফিরিয়া আসিলেন। মোটর তেমনি নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বাড়ির পশ্চাতে গারাজের দিকে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হিমাংশুবাবুর গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম; তিনি ভুবন বেয়ারাকে ডাকিয়া চায়ের বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দিতেছেন।

ব্যোমকেশ যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কুমার গাড়ি হইতে নামিলেন না; ব্যোমকেশকে নামাইয়া দিয়া শরীরটা তেমন ভাল ঠেকিতেছে না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন ব্যোমকেশের অনারে আর একবার চা আসিল। চা পান করিতে করিতে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। দেওয়ানজীও আসিয়া বসিলেন। ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হল?'

ব্যোমকেশ চায়ে চুমুক দিয়া বলিল, 'বিশেষ কিছু হল না। পুলিসের ধারণা হরিনাথ মাস্টারকে প্রজারা কেউ নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে।'

দেওয়ানজী বলিলেন, 'আপনার তা মনে হয় না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। আমার ধারণা অন্য রকম।'

'আপনার ধারণা হরিনাথ বেঁচে নেই?'

ব্যোমকেশ একটু বিস্মিতভাবে বলিল, 'আপনি কি করে বুঝলেন? ও, অজিত বলেছে। হ্যাঁ—আমার তাই ধারণা বটে। তবে আমি ভুলও করে থাকতে পারি।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। আমি অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া এমন কিছু বোধ হইল না যে সে আমার উপর চটিয়াছে; কিন্তু

মুখ দেখিয়া সকল সময় তাহার মনের ভাব বোঝা যায় না। কে জানে, হয়তো কথাটা ইহাদের কাছে প্রকাশ করিয়া অন্যায় করিয়াছি, ব্যোমকেশ নির্জনে পাইলেই আমার মুণ্ড চিবাইবে।

কালীগতি হঠাৎ বলিলেন, 'আমার বোধ হয় আপনি ভুলই করেছেন ব্যোমকেশবাবু। হরিনাথ সম্ভবতঃ মরেনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কালীগতির পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আপনি নতুন কিছু জানতে পেরেছেন?'

কালীগতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না—তাকে ঠিক জানা বলা চলে না; তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঐ বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

ব্যোমকেশ চমকিত হইয়া বলিল, 'বনের মধ্যে? এই দারুণ শীতে?'

'হ্যাঁ। বনের মধ্যে কাপালিকের ঘর বলে একটা কুঁড়ে ঘর আছে—রাত্রে বাঘ ভাল্লুকের ভয়ে সম্ভবতঃ সেই ঘরটায় লুকিয়ে থাকে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পেয়েছেন কি?'

'না। তবে আমার স্থির বিশ্বাস সে ঐখানেই আছে।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না।

রাত্রে শয়ন করিতে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চোরাবালির কথাটাও চারিদিকে রাষ্ট্র করে দিয়েছ তো?'

'না না—আমি শুধু কথায় কথায় বলেছিলুম যে—'

'বুঝেছি।' বলিয়া সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি তো ও কথা বলতে বারণ করনি।'

'তোমার মনের ভাব দেখছি রবিবাবুর গানের নায়কের মত—যদি বারণ কর তবে গাহিব না। এবং বারণ না করিলেই তারস্বরে গাহিব। যা হোক, আজ দুপুরবেলা কি করলে বল।'

দেখিলাম, ব্যোমকেশ সত্যসত্যই চটে নাই; বোধহয় ভিতরে ভিতরে তাহার ইচ্ছা ছিল যে ও কথাটা আমি প্রকাশ করিয়া ফেলি। অন্তত তাহার কাজের যে কোনো ব্যাঘাত হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহ।

আমি তখন দ্বিপ্রহরে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি সব বলিলাম; মন্ত্র-লেখা কাগজটাও দেখাইলাম। কাগজটা ব্যোমকেশ মন দিয়া দেখিল, কিন্তু বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। বলিল, 'নূতন কিছুই নয়—এসব আমার জানা কথা। এই লেখাটার দ্বিতীয় লাইন সম্পূর্ণ করলে হবে—

'রাত্রি ১১টা ৪৫মিঃ গতে অমাবস্যা পড়িবে। অর্থাৎ হরিনাথও পাঁজি দেখেছিল।'

হিমাংশুবাবুর বহির্গমনের কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল, কোন মন্তব্য করিল না। আমি তখন বলিলাম, 'দ্যাখ ব্যোমকেশ, আমার মনে হয় হিমাংশুবাবু আমাদের কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন। তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানি না, কিন্তু আমাদের অতিথিরূপে পেয়ে তিনি খুব খুশী হননি।'

ব্যোমকেশ মৃদুভাবে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'ঠিক ধরেছ। হিমাংশুবাবু যে কত উঁচু মেজাজের লোক তা ওঁকে দেখে ধারণা করা যায় না। সত্যি অজিত, ওঁর মতন সহৃদয় প্রকৃত ভদ্রলোক খুব কম দেখা যায়। যেমন করে হোক এ ব্যাপারে একটা রফা করতেই হবে।'

আমাকে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ না দিয়া ব্যোমকেশ পুনশ্চ বলিল, 'অনাদি সরকারের রাধা নামে একটি বিধবা মেয়ে আছে শুনেছ বোধহয়। তাকে আজ দেখলুম।'

আমি বোকার মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, সে বলিয়া চলিল, 'সতের-আঠার বছরের মেয়েটি—দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের পীড়নে আর লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়েছে।—দেখ অজিত, যৌবনের উন্মাদনার অপরাধকে আমরা বড় কঠিন শাস্তি দিই, বিশেষতঃ অপরাধী যদি স্ত্রীলোক হয়। প্রলোভনের বিরাট শক্তিকে হিসাবের মধ্যে নিই না, যৌবনের স্বাভাবিক অপরিণামদর্শিতাকেও হিসাব থেকে বাদ দিই। ফলে যে বিচার

করি সেটা সুবিচার নয়। আইনেও grave and sudden provocation বলে একটা সাফাই আছে। কিন্তু সমাজ কোনো সাফাই মানে না; আগুনের মত সে নির্মম, যে হাত দেবে তার হাত পুড়বে। আমি সমাজের দোষ দিচ্ছি না—সাধারণের কল্যাণে তাকে কঠিন হতেই হয়। কিন্তু যে-লোক এই কঠিনতার ভিতর থেকে পাথর ফাটিয়ে করুণার উৎস খুলে দেয় তাকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।'

ব্যোমকেশকে কখনো সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুনি নাই; অনাদি সরকারের কন্যাকে দেখিয়া তাহার ভাবের বন্যা উথলিয়া উঠিল কেন তাহাও বোধগম্য হইল না। আমি ফ্যালফ্যাল করিয়া কেবল তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস-মোচন করিয়া বলিল, 'আর একটা আশ্চর্য দেখছি, এসব ব্যাপারে মেয়েরাই মেয়েদের সব চেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি দেয়। কেন দেয় কে জানে!'

অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না; শেষে ব্যোমকেশ উঠিয়া পায়ের মোজা টানিয়া খুলিতে খুলিতে বলিল, 'রাত হল, শোয়া যাক। এ ব্যাপারটা যে কিভাবে শেষ হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। যা কিছু জ্ঞাতব্য সবই জানা হয়ে গেছে—অথচ লোকটাকে ধরবার উপায় নেই।' তারপর গলা নামাইয়া বলিল, 'ফাঁদ পাততে হবে, বুঝেছ অজিত, ফাঁদ পাততে হবে।'

আমি বলিলাম, 'যদি কিছু বলবে ঠিক করে থাকো তাহলে একটু স্পষ্ট করে বল। জ্ঞাতব্য কোনো কথাই আমি এখনো বুঝতে পারিনি।'

'কিছু বোঝোনি?'

'কিছু না।'

'আশ্চর্য! আমার মনে যা একটু সংশয় ছিল তা আজ শহরে গিয়ে ঘুচে গেছে। সমস্ত ঘটনাটি বায়স্কোপের ছবির মত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।'

অধর দংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শহরে সারাদিন কি করলে?'

ব্যোমকেশ জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, 'মাত্র দুটি কাজ। ইস্টিশানে অনাদি সরকারের মেয়েকে দেখলুম—তাকে দেখবার জন্যেই সেখানে লুকিয়ে বসেছিলুম। তারপর রেজিস্ট্রি অফিসে কয়েকটি দলিলের সন্ধান করলুম।'

'এইতেই এত দেরি হল?'

'হ্যাঁ। রেজিস্ট্রি অফিসের খবর সহজে পাওয়া যায় না—অনেক তদ্বির করতে হল।'

'তারপর?'

'তারপর ফিরে এলুম।' বলিয়া ব্যোমকেশ লেপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। তখন আমিও রাগ করিয়া শুইয়া পড়িলাম, আর কোনো কথা কহিলাম না।

ক্রমে তন্দ্রাবেশ হইল। নিদ্রাদেবীর ছায়া-মঞ্জীর মাথার মধ্যে রুমঝুম করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দরজার কড়া খুট্ খুট্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

ব্যোমকেশের বোধ করি তখনো ঘুম আসে নাই, সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

বাহির হইতে মৃদুকণ্ঠে আওয়াজ আসিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একবার দরজা খুলুন।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, দেওয়ান কালীগতি একটি কালো রঙের কম্বল গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

কালীগতি বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আসুন, একটা জিনিস দেখাতে চাই।—অজিতবাবু, জেগে আছেন নাকি? আপনিও আসুন।'

ব্যোমকেশ ওভারকোট গায়ে দিতে দিতে বলিল, 'এত রাত্রে! ব্যাপার কি?'

কালীগতি উত্তর দিলেন না। আমিও লেপ পরিত্যাগ করিয়া একটা শাল ভাল করিয়া

গায়ে জড়াইয়া লইলাম। তারপর দুইজনে কালীগতির অনুসরণ করিয়া বাহির হইলাম।

বাড়ি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমরা বাগানের ফটকের দিকে চলিলাম। অন্ধকার রাত্রি বহুপূর্বে চন্দ্রাস্ত হইয়াছে। ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ অথচ মন্থর একটা বাতাস যেন অলসভাবে বস্ত্রাচ্ছাদনের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আমি ভাবিতে লাগিলাম, বৃদ্ধ এহেন রাত্রে আমাদের কোথায় লইয়া চলিল। কতদূর যাইতে হইবে! ব্যোমকেশই বা এমন নির্বিচারে প্রশ্নমাত্র না করিয়া চলিয়াছে কেন?

কিন্তু ফটক পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই বুঝিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থান বেশীদূর নয়। কালীগতির বাড়ির সদর দরজায় একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল, সেটকে তুলিয়া লইয়া তাহার বাতি উস্কাইয়া দিয়া কালীগতি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, 'আসুন।'

কালীগতির বাড়িতে বোধহয় চাকর-বাকর কেহ থাকে না, কারণ বাড়িতে প্রবেশ করিয়া জনমানবের সাড়াশব্দ পাইলাম না। লণ্ঠনের শিখা বাড়ির অংশমাত্র আলোকিত করিল, তাহাতে নিকটস্থ দরজা জানালা ও ঘরের অন্যান্য দু'একটা আসবাব ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না। একপ্রস্থ সিঁড়ি ভাঙিয়া আমরা দোতলায় উঠিলাম; তারপর আর এক প্রস্থ সিঁড়ি। এই সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠিয়া কালীগতি লণ্ঠন কমাইয়া রাখিয়া দিলেন। দেখিলাম, আলিসা-ঘেরা খোলা ছাদে উপস্থিত হইয়াছি।

'এদিকে আসুন।' বলিয়া কালীগতি আমাদের আলিসার ধারে লইয়া গেলেন; তারপর বাহিরের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

উচ্চস্থান হইতে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য হইয়াছিল বটে কিন্তু গাঢ় অন্ধকার দৃষ্টির পথরোধ করিয়া দিয়াছিল। তাই চারিদিকে অভেদ্য তমিস্রা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল কালীগতির অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম বহুদূরে একটি মাত্র আলোকের বিন্দু চক্রবালশায়ী মঙ্গলগ্রহের মত আরক্তিম ভাবে জ্বলিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা আলো জ্বলছে। কিম্বা আগুনও হতে পারে। কোথায় জ্বলছে?'

কালীগতি বলিলেন, 'জঙ্গলের ধারে যে কুঁড়ে ঘরটা আছে তারই মধ্যে।'

'ও—যাতে সেই কাপালিক মহাপ্রভু ছিলেন। তা—তিনি কি আবার ফিরে এলেন নাকি?' ব্যোমকেশের ব্যঙ্গহাসি শুনা গেল।

'না—আমার বিশ্বাস এ হরিনাথ মাস্টার।'

'ওঃ!' ব্যোমকেশ যেন চমকিয়া উঠিল—'আজ সন্ধ্যেবেলা আপনি বলছিলেন বটে। কিন্তু আলো জ্বেলে সে কি করছে?'

'বোধহয় শীত সহ্য করতে না পেরে আগুন জ্বেলেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, শেষে মৃদুস্বরে বলিল, 'হতেও পারে—হতেও পারে। যদি সে বেঁচে থাকে—অসম্ভব নয়।'

কালীগতি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, সে বেঁচে আছে—ঐ আগুনই তার প্রমাণ। মনুষ্যসমাজ থেকে যে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে সে ছাড়া এই রাত্রে ওখানে আর কে আগুন জ্বালবে?'

'তা বটে!' ব্যোমকেশ আবার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'হরিনাথ মাস্টার হোক বা না হোক, লোকটা কে জানা দরকার অজিত, এখন ওখানে যেতে রাজী আছ?'

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'এখন? কিন্তু—'

কালীগতি বলিলেন, 'সব দিক বিবেচনা করে দেখুন। এখন গেলে যদি তাকে ধরতে পারেন তাহলে এখনি যাওয়া উচিত। কিন্তু এই অন্ধকারে কোনো রকম শব্দ না করে কুঁড়ে ঘরের কাছে এগুতে পারবেন কি? আলো নিয়ে যাওয়া চলবে না, কারণ আলো দেখলেই সে পালাবে। আর অন্ধকারে বন-বাদাড় ভেঙে যেতে গেলেই শব্দ হবে। কি করবেন, ভাল করে ভেবে দেখুন।'

তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। সব দিক ভাবিয়া শেষে স্থির হইল যে আজ রাত্রে যাওয়া নিরাপদ হইবে না; কারণ আসামী যদি একবার টের পায় তাহা হইলে আর গুহবে আসিবে না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেওয়ানজীর পরামর্শই ঠিক, আজ যাওয়া সমীচীন নয়। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আসামী যদি ভড়্‌কে না যায় তাহলে কালও নিশ্চয় আসবে। কাল আমি আর অজিত আগে থাকতে গিয়ে ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকব—বুঝেছেন? তারপর সে যেম্‌নি আসবে—'

কালীগতি বলিলেন, 'এ প্রস্তাব মন্দ নয়। অবশ্য এর চেয়েও ভাল মতলব যদি কিছু থাকে তাও ভেবে দেখা যাবে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত থাক।'

ছাদ হইতে নামিয়া আমরা নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। দেওয়ানজী আমাদের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। যাইবার সময় ব্যোমকেশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি তান্ত্রিকধর্মে বিশ্বাস করেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, ওসব বুজরুকি। আমি যত তান্ত্রিক দেখেছি, সব বেটা মাতাল আর লম্পট।'

কালীগতির চোখের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য কেমন যেন ঘোলাটে হইয়া গেল, তিনি মুখে একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ তবে শুয়ে পড়ুন। ভাল কথা, হিমাংশু বাবাজীকে আপাতত এসব কথা না বললেই বোধহয় ভাল হয়।'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ, তাঁকে এখন কিছু বলবার দরকার নেই।'

কালীগতি প্রস্থান করিলেন।

আমরা আবার শয়ন করিলাম। কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্রাহ্মণ আমার ওপর মনে মনে ভয়ঙ্কর চটেছেন।'

আমি বলিলাম, 'যাবার সময় তোমার দিকে যেরকম ভাবে তাকালেন তাতে আমারও তাই মনে হল। তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে ওসব কথা বলবার কি দরকার ছিল? উনি নিজে তান্ত্রিক—কাজেই ওঁর আঁতে ঘা লেগেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও কায়মনোবাক্যে তাই আশা করছি।'

তাহার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কাহারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়া কথা কওয়া তাহার অভ্যাস নয়, অথচ এক্ষেত্রে সে জানিয়া বুঝিয়াই আঘাত দিয়াছে। বলিলাম, 'তার মানে? ব্রাহ্মণকে মিছিমিছি চটিয়ে কোন লাভ হল নাকি?'

'সেটা কাল বুঝতে পারব। এখন ঘুমিয়ে পড়।' বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

পরদিন সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল। হিমাংশুবাবুকে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম—নানা কথাবার্তায় হাসি তামাসায় শিকারের গল্প আমাদের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। আমরা যে একটা গুরুতর রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনের জন্য তাঁহার অতিথি হইয়াছি তাহা যেন তিনি ভুলিয়াই গেলেন; একবারও সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলেন না।

বৈকালে চা-পান সমাপ্ত করিয়া ব্যোমকেশ কালীগতিকে একান্তে লইয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কালকের প্ল্যানই ঠিক আছে তো?'

কালীগতি চিন্তান্বিত ভাবে কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আপনি কি বিবেচনা করেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার বিবেচনায় যাওয়াই ঠিক, এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আজ রাত্রি দশটা নাগাদ চন্দ্রাস্ত হবে, তার আগেই আমি আর অজিত গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকব। যদি কেউ আসে তাকে ধরব।'

কালীগতি বলিলেন, 'যদি না আসে?'

'তাহলে বুঝব আমার আগেকার অনুমানই ঠিক, হরিনাথ মাস্টার বেঁচে নেই।'

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কালীগতি বলিলেন, 'বেশ, কিন্তু ঘরটা এখন গিয়ে

একবার দেখে এলে ভাল হত। চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন। ঘরটা বেলাবেলি দেখে না রাখলে আবার রাত্রে সেখানে যাবার অসুবিধা হবে।'

ঘরটা যে আমরা আগে দেখিয়াছি তাহা ব্যোমকেশ ভাঙিল না।

যথা সময় তিনজনে বনের ধারে কুটীরে উপস্থিত হইলাম। কালীগতি আমাদের কুটীরের ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, মেঝের উপর একস্তূপ ছাই পড়িয়া আছে। তা ছাড়া ঘরের আর কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

কালীগতি পিছনের কবাট খুলিয়া বালুর দিকে লইয়া গেলেন। বালুর উপর তখন সন্ধ্যার মলিনতা নামিয়া আসিতেছে। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'বাঃ। এদিকটা তো বেশ, যেন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।'

আমিও দেখাদেখি বলিলাম, 'চমৎকার!'

কালীগতি বলিলেন, 'আপনারা আজ রাত্রে এই ঘরে থাকবেন বটে কিন্তু আমার একটু দুর্ভাবনা হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি, একটা বাঘ নাকি সম্প্রতি জঙ্গলে এসেছে।'

আমি বলিলাম, 'তাতে কি, আমরা বন্দুক নিয়ে আসব।'

কালীগতি মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, 'বাঘ যদি আসে, অন্ধকারে বন্দুক কোনো কাজেই লাগবে না। যা হোক, আশা করি বাঘের গুজবটা মিথ্যে—বন্দুক আনবার দরকার হবে না; তবে সাবধানের মার নেই, আপনাদের সতর্ক করে দিই। যদি রাত্রে বাঘের ডাক শুনতে পান, ঘরের মধ্যে থাকবেন না, এই দিকে বেরিয়ে এসে আগল লাগিয়ে দেবেন, তারপর ঐ বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন। যদি বা বাঘ ঘরে ঢোকে বালির ওপর যেতে পারবে না।'

ব্যোমকেশ খুশী হইয়া বলিল, 'সেই ভাল—বন্দুকের হাঙ্গামায় দরকার নেই। অজিত আবার নূতন বন্দুক চালাতে শিখেছে, হয়তো বিনা কারণেই আওয়াজ করে বসবে; ফলে শিকার আর এদিকে ঘেঁষবে না।'

তারপর বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। মনটা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হিমাংশুবাবুর অস্ত্রাগারে বসিয়া গল্পগুজব হইল। এক সময় ব্যোমকেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা হিমাংশুবাবু, মনে করুন কেউ যদি একটা নিরীহ নির্ভরশীল লোককে জেনেশুনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেয়, তার শাস্তি কি?'

হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'মৃত্যু। A tooth for a tooth, an eye for an eye!

ব্যোমকেশ আমার দিকে ফিরিল—'অজিত, তুমি কি বল?'

'আমিও তাই বলি।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। মৃদুস্বরে বলিল, 'হিমাংশু-বাবু, আজ রাত্রে আমরা দু'জনে গিয়ে কাপালিকের কুঁড়েয় লুকিয়ে থাকব।'

বিস্মিত হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'সে কি! কেন?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে কারণ ব্যক্ত করিয়া শেষে কহিল, 'কিন্তু আমাদের একলা যেতে সাহস হয় না। আপনাকেও যেতে হবে।'

হিমাংশুবাবু সোৎসাহে বলিলেন, 'বেশ বেশ, নিশ্চয় যাব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনি যাচ্ছেন একথা যেন আকারে ইঙ্গিতেও কেউ না জানতে পারে। তা হলেই সব ভেস্তে যাবে। শুনুন, আমরা আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময় বাড়ি থেকে বেরুব; আপনি তার আধঘণ্টা পরে বেরুবেন, কেউ যেন জানতে না পারে। এমন কি, আমাদের যাবার কথা আপনি জানেন সে ইঙ্গিতও দেবেন না।'

'বেশ।'

'আর আপনার সব চেয়ে ভাল রাইফেলটা সঙ্গে নেবেন। আমরা শুধু হাতেই যাব।'

রাত্রি ন'টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া আমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। সাজগোজ করিয়া বাহির হইতে ঠিক সাড়ে ন'টা বাজিল।

বাগান পার হইয়া মাঠে পদার্পণ করিয়াছি এমন সময় চাপা কণ্ঠে কে ডাকিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

পাশে তাকাইয়া দেখিলাম, একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া কালীগতি আসিতেছেন। তিনি বোধহয় এতক্ষণ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কাছে আসিয়া বলিলেন, 'যাচ্ছেন? বন্দুক নেননি দেখছি। বেশ—মনে রাখবেন, যদি বাঘের ডাক শুনতে পান, বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন।'

'হ্যাঁ—মনে আছে।'

চন্দ্র অস্ত যাইতে বিলম্ব নাই, এখনি বনের আড়ালে ঢাকা পড়িবে। কালীগতির মৃদু-কথিত 'দুর্গা দুর্গা' শুনিয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কুটীরে পেঁছিয়া ব্যোমকেশ পকেট হইতে টর্চ বাহির করিল, নিমেষের জন্য একবার জ্বালিয়া ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল। তারপর নিজে মাটির উপর উপবেশন করিয়া বলিল, 'বোসো।'

আমি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সিগারেট ধরাতে পারি?'

'পারো। তবে দেশলাইয়ের আলো হাত দিয়ে আড়াল করে রেখো।'

দুজনে উত্তরূপে দেশলাই জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিলাম।

আধঘণ্টা পরে বাহিরে একটু শব্দ হইল। ব্যোমকেশ ডাকিল, 'হিমাংশুবাবু, আসুন।'

হিমাংশুবাবু রাইফেল লইয়া আসিয়া বসিলেন। তখন তিনজনে সেই কুঁড়ে ঘরের মেঝেয় বসিয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরম্ভ করিলাম। মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে দু'একটা কথা হইতে লাগিল। হিমাংশুবাবুর কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির রেডিয়ম-দ্যুতি সময়ের নিঃশব্দ সঞ্চার জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

বারোটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিটের সময় একটা বিকট গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তিনজনেই লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বন্য বাঘের ক্ষুধার্ত ডাক আগে কখনো শুনি নাই—বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। হিমাংশুবাবু চাপা গলায় বলিলেন, 'বাঘ।' তাহার রাইফেলে খুট্ করিয়া শব্দ হইল, বুঝিলাম তিনি রাইফেলে টোটা ভরিলেন।

বাঘের ডাকটা বনের দিক হইতে আসিয়াছিল। হিমাংশুবাবু পা টিপিয়া টিপিয়া খোলা দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার গাঢ়তর দেহরেখা অন্ধকারের ভিতর অস্পষ্টভাবে উপলব্ধ হইল। আমরা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হিমাংশুবাবু ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'শব্দভেদী'—ব্যোমকেশের স্বর যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল।

হিমাংশুবাবু শুনিতে পাইলেন কি না জানি না, তিনি কুটীরের বাহিরে দুই পদ অগ্রসর হইয়া বন্দুক তুলিলেন।

এই সময় আবার সেই দীর্ঘ হিংস্র আওয়াজ যেন মাটি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিল। এবার শব্দ আরো কাছে আসিয়াছে, বোধহয় পঞ্চাশ গজের মধ্যে। শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইতে না যাইতে হিমাংশুবাবুর বন্দুকের নল হইতে একটা আগুনের রেখা বাহির হইল। শব্দ হইল—কড়াং!

সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা গুরুভার পতনের শব্দ। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'পড়েছে। ব্যোমকেশবাবু, টর্চ বার করুন।'

টর্চ ব্যোমকেশের হাতেই ছিল, সে বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালিল; ঘর হইতে বাহির হইয়া আগে আগে যাইতে যাইতে বলিল, 'আসুন।'

আমরা তাহার পশ্চাতে চলিলাম। হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'বেশী কাছে যাবেন না; যদি শুধু জখম হয়ে থাকে—'

কিন্তু বাঘ কোথায়? বনের ঠিক কিনারায় একটা কালো কম্বল-ঢাকা কি যেন পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে গিয়া টর্চের পরিপূর্ণ আলো তাহার উপর ফেলিতেই হিমাংশুবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'একি! এ যে দেওয়ানজী!'

দেওয়ান কালীগতি কাৎ হইয়া ঘাসের উপর পড়িয়া আছেন। তাঁহার রক্তাক্ত নগ্ন বক্ষ হইতে কম্বলটা সরিয়া গিয়াছে। চক্ষু উন্মুক্ত; মুখের একটা পাশবিক বিকৃতি তাঁহার অন্তিমকালের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে।

ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া তাঁহার বুকের উপর হাত রাখিল, তারপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'গতাসু। যদি প্রেতলোক বলে কোনো রাজ্য থাকে তাহলে এতক্ষণে হরিনাথ মাস্টারের সঙ্গে দেওয়ানজীর মুলাকাত হয়েছে।'

তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে মর্মপীড়ার কোনো আভাসই পাওয়া গেল না।

হিসাবের খাতা কয়টা হিমাংশুবাবুর দিকে ঠেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এগুলো ভাল করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন, এক লক্ষ টাকা দেনা কেন হয়েছে।'

আমরা তিনজনে বৈঠকখানার ফরাসের উপর বসিয়াছিলাম। কালীগতির মৃত্যুর পর দুই দিন অতীত হইয়াছে। তাঁহার লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া হিসাবের খাতা চারিটা ও আরও অনেক দলিল ব্যোমকেশ বাহির করিয়াছিল।

হিমাংশুবাবুর চক্ষু হইতে বিভীষিকার ছায়া তখনো সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। তিনি করতলে চিবুক রাখিয়া বসিয়াছিলেন, ব্যোমকেশের কথায় মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এখনো যেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না—ভাবতে গেলেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থায় গুলিয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আমি টুকরো টুকরো প্রমাণ থেকে এই রহস্য কাহিনীর যে কাঠামো খাড়া করতে পেরেছি তা আপনাকে বলছি, শুনুন। কিন্তু তার আগে এই রেজিস্ট্রি দলিলগুলো নিন।'

'কি এগুলো?' বলিয়া হিমাংশুবাবু দলিলগুলি হাতে লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি যে-মহাজনের কাছে তমসুক লিখে টাকা ধার নিয়েছিলেন, সেই মহাজন সেই সব তমসুক রেজিস্ট্রি করে কালীগতিকে বিক্রি করে। এগুলো হচ্ছে সেই সব তমসুক আর তার বিক্রি কবালা।'

'কালীগতি এইসব তমসুক কিনেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আপনারই টাকায় কিনেছিলেন; যাকে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা।'

হিমাংশুবাবু উদ্‌ভ্রান্তভাবে দেয়ালের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'ওগুলো এখন ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, কারণ কালীগতি আর আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আসবেন না। তিনি ঋণের দায়ে আপনার আস্ত জমিদারীটাই নিলাম করে নেবেন ভেবেছিলেন—আরো বছর দুই এইভাবে চালাতে পারলে করতেনও তাই। কিন্তু মাঝ থেকে ঐ ন্যালাখ্যাপা অঙ্ক-পাগলা মাস্টারটা এসে সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

আমি বলিলাম, 'না না, ব্যোমকেশ, গোড়া থেকে বল।'

ব্যোমকেশ ধীরভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'গোড়া থেকেই বলছি। হিমাংশুবাবুর বাবা মারা যাবার পর কালীগতি যখন দেখলেন যে নূতন জমিদার বিষয় পরিচালনায় উদাসীন তখন তিনি ভারী সুবিধা পেলেন। হিসাবের খাতা তিনি লেখেন, তাঁর মাথার ওপর পরীক্ষা করবার কেউ নেই—সুতরাং তিনি নির্ভয়ে কিছু কিছু টাকা তছরুপ করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল। কিন্তু নাল্পে সুখমস্তি—ও প্রবৃত্তিটা ক্রমশ বেড়েই চলে। এদিকে জমিদারীর আয়-ব্যয়ের একটা বাঁধা হিসেব আছে, বেশী গরমিল হলেই ধরা পড়বার সম্ভাবনা। তিনি তখন এক মস্ত চাল চাললেন, বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিয়ে দিলেন। খরচ আর বাঁধাবাঁধির মধ্যে রইল না; আদালতে ন্যায্য এবং ন্যায়-বহির্ভূত দুই রকমই খরচ আছে, সুতরাং স্বচ্ছন্দে গোঁজামিল দেওয়া চলে।

কালীগতির চুরির খুব সুবিধা হল।

'প্রথমটা বোধহয় কালীগতি কেবল চুরি করবার মতলবেই ছিলেন, তার বেশী উচ্চাশা করেননি। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক তান্ত্রিক এসে হাজির হল—এবং আপনি প্রথমেই তার বিষ-নজরে পড়ে গেলেন। কালীগতি তার কাছ থেকে মন্ত্র নিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কুমন্ত্রণা গ্রহণ করলেন। আমার বিশ্বাস এই কাপালিকই জমিদারী আত্মসাৎ করবার পরামর্শ কালীগতিকে দেয়; কারণ হিসেবের খাতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, সে আসবার পর থেকেই চুরির মাত্রা বেড়ে গেছে।

'স্বাভাবিক লোভ ছাড়াও একটা ধর্মান্ধতার ভাব কালীগতির মধ্যে ছিল। ধর্মান্ধতা মানুষকে কত নৃশংস করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। কালীগতি গুরুর প্ররোচনায় অন্নদাতার সর্বনাশ করতে উদ্যত হলেন। তিনি যে কৌশলটি বার করলেন সেটি যেমন সহজ তেমনি কার্যকর। প্রথমে আপনার টাকা চুরি করে তহবিল খালি করে দিলেন, পরে খরচের টাকা নেই ওই অজুহাতে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ালেন, এবং শেষে মহাজনের কাছ থেকে আপনারই টাকায় সেই তমসুক কিনে নিলেন। কালীগতি বিনা খরচে আপনার উত্তমর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন। আপনি কিছুই জানতে পারলেন না।

'এইভাবে বেশ আনন্দে দিন কাটছে, হঠাৎ একদিন কোথা থেকে হরিনাথ এসে হাজির হল। আপনি তাকে বেবির মাস্টার রাখলেন। বড় ভালমানুষ বেচারা, দু'চার দিনের মধ্যে কালীগতির ভক্ত হয়ে উঠল; কালীগতি তাকে তান্ত্রিক ধর্ম-মাহাত্ম্য শেখাতে লাগলেন। কালীমূর্তির এক পট হরিনাথ তাঁর কাছ থেকে এনে নিজের ঘরের দেওয়ালে ভক্তিভরে টাঙিয়ে রাখলে।

'কিন্তু শুধু ধর্মে তার পেট ভরে না—সে অঙ্ক-পাগল। বেবিকে সে যোগ বিয়োগ শেখায়, আর নিজের মনে বেবির খাতায় বড় বড় অঙ্ক কষে। কিন্তু তবু নিজের কল্পিত অঙ্কে সে সুখ পায় না।

'একদিন আলমারি খুলে সে হিসেবের খাতাগুলো দেখতে পেলে। অঙ্কের গন্ধ পেলে সে আর স্থির থাকতে পারে না—মহা আনন্দে সে খাতাগুলো পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দিলে। যতই হিসেবের মধ্যে ঢুকতে লাগল, ততই দেখলে হাজার হাজার টাকার গরমিল। হরিনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'কিন্তু এই আবিষ্কারের কথা সে কাকে বলবে? আপনার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হয় না, উপরন্তু আপনার সঙ্গে উপযাচক হয়ে দেখা করতে সে সাহস করে না। এ অবস্থায় যা সব চেয়ে স্বাভাবিক সে তাই করলে—কালীগতিকে গিয়ে হিসেব গরমিলের কথা বললে।

'কালীগতি দেখলেন—সর্বনাশ! তাঁর এতদিনের ধারাবাহিক চুরি ধরা পড়ে যায়। তিনি তখনকার মত হরিনাথকে স্তোকবাক্যে বুঝিয়ে মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে, হরিনাথকে সরাতে হবে, এবং এই সঙ্গে ঐ খাতাগুলো। নইলে তাঁর দুষ্কৃতির প্রমাণ থেকে যাবে। এতদিন যে সেগুলো কোনো ছুতোয় নষ্ট করে ফেলেননি এই অনুতাপ তাঁকে ভীষণ নিষ্ঠুর করে তুললে।

'এইখানে এই কাহিনীর সবচেয়ে ভয়াবহ আর রোমাঞ্চকর ঘটনার আবির্ভাব। হরিনাথকে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে, অথচ ছুরি ছোরা চালানো বা বিষ-প্রয়োগ চলবে না। তবে উপায়?

'যে চোরাবালি থেকে আপনার জমিদারীর নামকরণ হয়েছে সেই চোরাবালির সন্ধান কালীগতি জানতেন। সম্ভবতঃ তাঁর গুরু কাপালিকের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন; কারণ চোরাবালিটা কাপালিকের কুঁড়ের ঠিক পিছনেই। আমরাও সেদিন সকালে পাখী মারতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই ভয়ঙ্কর চোরাবালির সন্ধান পেয়েছিলুম।

'কালীগতি মাস্টারকে সরাবার এক সম্পূর্ণ নূতন উপায় উদ্ভাবন করলেন। চমৎকার উপায়। হরিনাথ মাস্টার মরবে অথচ কেউ বুঝতেই পারবে না যে সে মরেছে। তাঁর ওপর সন্দেহের ছায়াপাত পর্যন্ত হবে না, বরঞ্চ খাতাগুলো অন্তর্ধানের বেশ একটা স্বাভাবিক কারণ পাওয়া যাবে।

'গত অমাবস্যার দিন তিনি হরিনাথকে বললেন, 'তুমি যদি মন্ত্রসিদ্ধ হতে চাও তো আজ রাত্রে ঐ 'কুড়ে ঘরে গিয়ে মন্ত্র সাধনা কর।' হরিনাথ রাজী হল; সে বোবির খাতায় মন্ত্রটা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখল।

'রাত্রে সবাই ঘুমুলে হরিনাথ নিজের ঘর থেকে বার হল। সে সাধনা করতে যাচ্ছে, তার জামা জুতো পরবার দরকার নেই, এমন কি সে চশমাটাও সঙ্গে নিলে না—কারণ অমাবস্যার রাত্রে চশমা থাকা না থাকা সমান।

'কালীগতি তাকে কুটীর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। আসবার সময় বলে এলেন—'যদি বাঘের ডাক শুনতে পাও ভয় পেও না, পিছনের দরজা দিয়ে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়িও; সেখানে বাঘ যেতে পারবে না।'

'হরিনাথ জপে বসল। তারপর যথাসময় বাঘের ডাক শুনতে পেল। সে কি ভয়ঙ্কর ডাক, তা আমরাও সেদিন শুনেছি। হিমাংশুবাবুর মতন পাকা শিকারীও বুঝতে পারেননি যে এ নকল ডাক। কালীগতি জন্তু-জানোয়ারের ডাক অদ্ভুত নকল করতে পারতেন। প্রথম দিন এখানে এসেই আমরা তাঁর শেয়াল ডাক শুনেছিলুম।

'বাঘের ডাক শুনে অভাগা হরিনাথ ছুটে গিয়ে বালির ওপর দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোরাবালির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। একটা চীৎকার হয়তো সে করেছিল কিন্তু তাও অর্ধপথে চাপা পড়ে গেল। তার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।'

একটু চুপ করিয়া ব্যোমকেশ আবার বলিতে লাগিল, 'কালীগতি কার্য সুসম্পন্ন করে ফিরে এসে সেই রাত্রেই হরিনাথের ঘর থেকে খাতা সরিয়ে ফেললেন। তার পরদিন যখন হরিনাথকে পাওয়া গেল না তখন রটিয়ে দিলেন যে সে খাতা চুরি করে পালিয়েছে।

'হরিনাথের অন্তর্ধানের কৈফিয়ৎ বেশ ভালই হয়েছিল কিন্তু তবু কালীগতি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কে জানে যদি কেউ সন্দেহ করে যে, হরিনাথ শুধু খাতা নিয়ে পালাবে কেন? নিশ্চয় এর মধ্যে কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে। তখন তিনি সিন্দুক থেকে দু'হাজার টাকাও সরিয়ে ফেললেন। এই সময়ে আপনার চাবি হারিয়েছিল, সুতরাং সন্দেহটা সহজেই কালীগতির ঘাড় থেকে নেমে গেল—সবাই ভাবলে হারানো চাবির সাহায্যে হরিনাথই টাকা চুরি করেছে। কালীগতির ডবল লাভ হল, টাকাও পেলেন, আবার হরিনাথের অপরাধও বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল।

'তারপর আমি আর অজিত এলুম। এই সময়ে বাড়িতে আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল যার সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা আমাদের সমাজের একটা চিরন্তন ট্র্যাজেডি—বিধবার পদস্খলন, নূতন কিছুই নয়। অনাদি সরকারের বিধবা মেয়ে রাধা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। তারা অনেক যত্ন করে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু শেষে আপনার স্ত্রী জানতে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে এসে বলেন যে, এসব অনাচার এ বাড়িতে চলবে না, ওদের আজই বিদেয় করে দাও।—কেমন, ঠিক কি না?'

শেষের দিকে হিমাংশুবাবু বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, এখন একবার ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'কিন্তু আপনার মনে দয়া হল; আপনি ঐ অভাগী মেয়েটাকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না। এই নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু মনোমালিন্যও হয়েছিল। যা হোক, আপনি যখন বুঝলেন যে ওরা ভ্রূণহত্যার অপরাধে অপরাধী নয়, তখন রাধাকে চুপি চুপি তার মাসীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। পাছে আপনার আমলা বা চাকর-বাকরদের মধ্যেও জানাজানি হয়, এই জন্যে নিজে গাড়ি চালিয়ে তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

'অনাদি সরকারের ভাগ্য ভাল যে সে আপনার মত মনিব পেয়েছে; অন্য কোনো মালিক এতটা করত বলে আমার মনে হয় না।

'সে যা হোক, এই ব্যাপারের সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের ঘটনা জড়িয়ে গিয়ে সমস্তটা আমার কাছে অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। তারপর অতি কষ্টে জট ছাড়ালুম;

রাধাকে দেখবার জন্যে স্টেশনে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইলুম। তার চেহারা দেখেই বুঝলুম এ ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই—তার ট্র্যাজেডি অন্য রকম। তখন আর সন্দেহ রইল না যে কালীগতিই হরিনাথকে খুন করেছেন। লোকটি কতবড় নৃশংস আর বিবেকহীন তার জ্বলন্ত প্রমাণ পেলুম রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্তু তাঁকে ধরবার উপায় নেই; যে খাতাগুলো থেকে তাঁর চুরি-অপরাধ প্রমাণ হতে পারত সেগুলো তিনি আগেই সরিয়েছেন। হয়তো পুড়িয়ে ফেলেছেন, নয়তো হরিনাথের সঙ্গে ঐ চোরাবালিতেই ফেলে দিয়েছেন।

'কালীগতি প্রথমটা বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু যখন অজিতের মুখে শুনলেন যে হরিনাথের মৃত্যুর কথা আমি বুঝতে পেরেছি তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে হরিনাথ মরেনি, প্রমাণস্বরূপ নিজেই কুঁড়ে ঘরে আগুন জেবলে রেখে এসে দুপুর রাত্রে আমাদের দেখালেন। আমি তখন এমন ভাব দেখাতে লাগলুম যেন তাঁর কথা সত্যি হলেও হতে পারে। আমরা ঠিক করলুম রাত্রে গিয়ে কুঁড়ে ঘরে পাহারা দেব। তিনি রাজী হলেন বটে কিন্তু কাউকে একথা বলতে বারণ করে দিলেন।

'আমাদের মারবার ফন্দি প্রথমে কালীগতির ছিল না; তাঁর প্রথম চেষ্টা ছিল আমাদের বোঝান যে হরিনাথ বেঁচে আছে। কিন্তু যখন দেখলেন যে আমরা হরিনাথের জন্যে কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বসে থাকতে চাই, তখন তাঁর ভয় হল যে, এইবার তাঁর সব কল-কৌশল ধরা পড়ে যাবে। কারণ হরিনাথ যে কুঁড়ে ঘরে আসতেই পারে না, একথা তাঁর চেয়ে বেশী কে জানে? তখন তিনি আমাদের চোরাবালিতে পাঠাবার সংকল্প করলেন। আমিও এই সুযোগই খুঁজছিলুম; আমাদের খুন করবার ইচ্ছাটা যাতে তাঁর পক্ষে সহজ হয় সে চেষ্টারও ত্রুটি করিনি। তান্ত্রিক এবং তন্ত্র-ধর্মকে গালাগালি দেবার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

'পরদিন বিকেলে তিনি আমাদের নিয়ে কুঁড়ে ঘর দেখাতে গেলেন। সেখানে গিয়ে কথাচ্ছলে বললেন, রাত্রে যদি আমরা বাঘের ডাক শুনতে পাই তাহলে যেন বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াই।

'এই হল সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত যা ঘটেছিল তার বিবরণ। তারপর যা যা ঘটেছে সবই আপনি জানেন।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না। তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আমাকে সে-রাত্রে রাইফেল নিয়ে যেতে কেন বলেছিলেন ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ কোনো উত্তর দিল না। হিমাংশুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি জানতেন আমি বাঘের ডাক শুনে শব্দভেদী গুলি ছুঁড়ব?'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, বলিল, 'সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। হিমাংশুবাবু, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না। মৃত্যুই ছিল কালীগতির একমাত্র শাস্তি। তিনি যে ফাঁসি-কাঠে না ঝুলে বন্দুকের গুলিতে মরেছেন এটা তাঁর ভাগ্য—আপনি নিমিত্ত মাত্র। মনে আছে, সেদিন রাত্রে আপনিই বলেছিলেন— a tooth for a tooth, an eye for an eye?'

এই সময় বাহিরের বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। পরক্ষণেই ব্যস্ত-সমস্তভাবে কুমার ত্রিদিব প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে একখানা খবরের কাগজ। তিনি বলিলেন, 'হিমাংশু, এসব কি কান্ড! দেওয়ান কালীগতি বন্দুকের গুলিতে মারা গেছেন?' বলিয়া কাগজখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি কিছুই জানতাম না; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলুম তাই কদিন আসতে পারিনি। আজ কাগজ পড়ে দেখি এই ব্যাপার। ছুটতে ছুটতে এলুম। ব্যোমকেশবাবু, কি হয়েছে বলুন দেখি।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার আগে কাগজখানা হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে লেখা ছিল—

'চোরাবালি নামক উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদারী হইতে একটি শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ

পাওয়া গিয়াছে। চোরাবালির জমিদার কয়েকজন বন্ধুর সহিত রাত্রিকালে নিকটবর্তী জঙ্গলে বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। বাঘের ডাক শুনিতে পাইয়া জমিদার হিমাংশুবাবু বন্দুক ফায়ার করেন। কিন্তু মৃতদেহের নিকট গিয়া দেখিলেন যে বাঘের পরিবর্তে জমিদারীর পুরাতন দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য গুলির আঘাতে মরিয়া পড়িয়া আছেন।

'বৃদ্ধ দেওয়ান এই গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে কেন গিয়াছিলেন এ রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিতেছে না।

'জমিদার হিমাংশুবাবু দেওয়ানের মৃত্যুতে বড়ই মর্মাহত হইয়াছেন, পুলিস-তদন্ত দ্বারা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এই দুর্ঘটনার জন্য হিমাংশুবাবু কোন অংশে দায়ী নহেন—তিনি যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন।'

কাগজখানা রাখিয়া দিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আলস্য ভাঙিয়া কুমার ত্রিদিবকে বলিল, 'চলুন, এবার আপনার রাজ্যে ফেরা যাক, এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে। পথে যেতে যেতে কালীগতির শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী আপনাকে শোনাব।'